অনিলকুমার সিংহ

শনাল পাবলিশিং হ
৮৭, চৌরঙ্গী রোড

প্রকাশক

সৌরেন্দ্রনাথ সিংহ

ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস

৮৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা

মুদ্রাকর

সুধাংশুরঞ্জন সেন

ট্রুথ প্রেস, ৩ ব্রজেন রোড

কলিকাতা

ছবি ও প্রচ্ছদপট

দেবব্রত ঘোষ

ব্লক নির্মাণ

ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও

রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

স্টার হাফটোন কোম্পানী

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ

ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও

৭২।১, কলেজ স্ট্রীট

কলিকাতা

দাম ছ টাকা

থম প্রকাশ ৯ই আগস্ট ১৯৪৫ ২৪শে শ্রাবণ ১৩৫২

চিন্মোহন সেহানবীশকে

ঐতিহাসিক

মহকুমা ছাড়িয়ে কয়েক ক্রোশ দূরেই এলোমেলো অবিন্যস্ত গ্রাম। খড়ের ঘরগুলো যেন যে যেখানে ইচ্ছে মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠেছে। তার চারদিকে এবড়ো খেবড়ো চাষের জমি। সবুজ, কালো, ধূসর—শেওলা ঢাকা মাটি যেন দূর চক্রবাল পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে থেমে গেছে। তার পর চোখ যায় না। মাটির উঁচু নীচু ঢেউ চক্রবালের কিনার পর্যন্ত গিয়ে বার বার ফিরে আসে।

রামগতি ক্ষেতমজুর। সে যে দিন মর্জি কাজে যায়। যে দিন মর্জি যায় না। এক দিনের মতন রসদ ঘরে থাকলেই হল। রামগতি তাতেই খুশী। সঙ্গীরা তবু কাজে যাবার সময়ে একবার তার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে যায়। শুধোয়—আজ কাজে গেলি না মোড়ল? হুঁকোয় টান দিতে দিতে জবাব দেয় রামগতি—না, রাত থেকে শরীরটা যেন কেমন কেমন করে রতন ভাই। সঙ্গীরা রামগতির বউকে কুলোয় চাল ঝাড়তে দেখে সব বুঝতে পারে। আর কোনো কথা বলে না।

কেরামত ভাগে চাষ করে। লেয়াকতের ছ আনা, তার দশ আনা।

অনেকে কথা বলে—ঠিক বলেছেন বাবু, দু বেলা পেট ভরে খেতে পেলে আজ আর এ অবস্থা হবে কেন?

লক্ষ্মীকান্তর গলার স্বর আর এক পর্দা উঁচুতে ওঠে—যুদ্ধের জন্যে সমস্ত জিনিসপত্রের দাম আটকারা হয়েছে কিন্তু তার অনুপাতে তোমাদের আয় বাড়ে নি। তাই তোমাদের ছেলেমেয়েরা—ভাই বোনরা—পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। তোমরা যারা আজ মাটি আঁকড়ে পড়ে আছো তাদের যে কি অবস্থা হবে তাই বা কে বলতে পারে।

রামগতি গাছের একধারে বসে কান খাড়া করে কথা শুনতে শুনতে মনের আনন্দে হুঁকোয় টান দেয়। লক্ষ্মীকান্তকে সে বিলক্ষণ চেনে। হারান ভট্‌চাযের ছেলে লক্ষ্মীকান্ত। বাপ বেঁচে থাকতে মহকুমার ইস্কুলে সে এণ্ট্রান্স পর্যন্ত পড়েছে। যজমানদের বাড়ীতে পুজো করে আর অন্নপ্রাশন ও বিয়ের সময়ে পৌরহিত্য করে হারানের দক্ষিণ হাতে যে ক পয়সা আসত তাতে সংসার চলত এক রকম। লক্ষ্মীকান্তও ইস্কুল ফি বাদে কিছু হাত খরচাও পেত। কিন্তু হারান মারা গেল একদিন। লক্ষ্মীকান্তও পরীক্ষা শেষ করে মুখ ভার করে ফিরে এল গ্রামে। কিছুদিন বসে থাকল বেকার। তার পর বাপের কাজ নেয়াই স্থির করল। সেই থেকে সে যজমান চরিয়ে আসছে গ্রামে গ্রামে। তার গ্রামে সেই একমাত্র পুরুত নয়—আরো আছে। সুতরাং দক্ষিণা ভাগ হয়ে যায়। লক্ষ্মীকান্তর সংসারে তার মা ও দুই ভাই ছাড়া আরো লোক আছে। তারা হল তার রুগ্না স্ত্রী ও পর পর ছটি রোগা রোগা ছেলে মেয়ে। লক্ষ্মীকান্তর স্ত্রী বছর বছর সন্তানের জন্ম দেয়। যুদ্ধের প্রথম দিকে কোনোমতে কায়ক্লেশে চলে যাচ্ছিল সংসারযাত্রা। ক্রমে অচল হয়ে পড়ল। গঞ্জে নতুন ধানের দর উঠল আঠারো থেকে বিশ। গোবর্ধন সাহার দোকান লুট হয়ে গেল রাতারাতি। লক্ষ্মীকান্তও চারদিক অন্ধকার

দেখল। কপালে গিয়ে উঠল—পুর্জো আচ্চা। দক্ষিণা নামল এসে রূপো থেকে তামায়। তবু লক্ষীকান্তর কপাল ভালো। অন্যদের মতন সে অশিক্ষিত নয়। এণ্ট্রান্স পর্যন্ত পড়েছে সে। কয়েক ডজন ইংরেজী বইও সে হজম করেছে। তাই একদিন ডাকঘরের পঞ্চু পিওনের মুখেই খবরটা রটে গেল যে লক্ষীকান্ত আজকাল নাকি কেষ্টু বিষ্টু লোক। সরকার থেকে বাঁধা মাইনে পায়। তার ওপর লোক প্রতি কিছু উপরি সে তো আছেই। কাজ হল গ্রামে গ্রামে টহল দিয়ে বেড়ানো, কথায় জৌলুসে আর টাকার চটকে জোয়ান লোকদের যুদ্ধে পাঠানো। হুঁকোয় টান দিতে দিতে কথাগুলো নিজের মনে রোমন্থন কর্তে আরাম লাগে রামগতির। তাহলে লক্ষীকান্ত আজকাল একটা বক্তা হয়ে উঠেছে যা হোক!

লক্ষীকান্ত ভীড়ের দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার বলে—তোমরা সব না খেতে পেয়ে মরবে না লড়াই করতে যাবে বীরের মতন? সেখানে গেলে তোমাদের কোনো দুঃখ কষ্ট থাকবে না। পেট ভরে খেতে পাবে। মাইনে পাবে পকেট ভর্তি। গায়ে নতুন পোষাক উঠবে। মোটর গাড়ী চড়ে বেড়াবে। তার পর কাঁধে বন্দুক চাপিয়ে টহল দিয়ে বেড়াবে এ দেশ থেকে ও দেশ।

বঙ্কু ড্রাম পেটার অনুকরণে ঢাকের ওপর কাঠি দেয়। তার পর মিলিটারী বুট পরে সামরিক কায়দায় চলার অনুকরণে কয়েক গজ এগিয়ে গিয়ে পিছিয়ে আসে। বলে—গট্ মট্ গট্ মট্ এমনি ধরনে চলে বেড়াবি, বুঝলি মানকের পো। একবার গিয়েই দেখ না। এখানে তো ভূত সেজে বেড়াস। চুলগুলোর ছিরি দেখলে মনে হয় বুঝি বা সাধু বনে গেলি। ওখানে গিয়ে ইয়া বোতল বোতল তেল মাথায় দিবি। মাথায় খাকি টুপি উঠবে। মাইরি দিব্যি আরামে থাকবি কিন্তু।

যেন ফিরে চলেছে যুদ্ধ জয় করে। কপালে তার ঐতিহাসিক রেখা আর দুঃখ ভারাক্রান্ত জীবনের কদর্য ছাপ! শুধু কাগজের কয়েকটা নোট বই তো নয়। কিন্তু তাই দিয়েই চলবে তার সংসারযাত্রা। গঞ্জে নতুন চালের দর সাতাশ টাকা। লক্ষ্মীকান্তর সংসারে মাসে দু থেকে আড়াই মন চালের খরচ। যজমানরা চাল দেয় না আজকাল। দক্ষিণে দিয়ে বিদেয় করে। তার ওপর আজ একটা নতুন লোক বাড়বে তার সংসারে। আসবার সময়ে যে ভাবে যন্ত্রনায় ছটফট করছিল তার পোয়াতি বউটা! পাপস্! ঐ হাড়সার স্ত্রিলোকটা এত সন্তানের জন্ম দিতেও পারে। লক্ষ্মীকান্তর কপালে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে রেখাগুলো।

চিন্তার শেষ নেই লক্ষ্মীকান্তর। এই ভাবে মানুষ ঠেঙিয়ে বেড়াতে ভালো লাগে না তার। দ্বারিক, এরফান, এনায়েৎ, রামলাল—কী রকম নিষ্প্রাণ, নিরুৎসাহ যেন তারা। হত যদি তারা অন্য জগতের লোক? যুদ্ধ, বিগ্রহ, শোষণ—ভেঙে যেন থান থান হয়ে গেছে সব। কোন্ দূর দেশের স্রোত এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তাকে। ওরা যেন উঠছে। উঠে দাঁড়াচ্ছে ঘুম থেকে। লক্ষ্মীকান্তর লিকলিকে পা দুটো এক রাশ ধুলো ঘেঁটে এগিয়ে চলে শহরের দিকে। ঝড় ওঠে তার মনে। ঐশ্বর্যময় জীবনের ঝড়। কোথায় যেন ভেঙে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে অন্যায়ের টুকরো গুলো।

ডাক শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে লক্ষ্মীকান্ত। ডান দিকের মাঠের আল ভেঙে বুড়ো বিপিন মণ্ডল এগিয়ে আসে খোঁড়াতে খোঁড়াতে।

গড় করি ঠাকুরমশাই। বিপিন মাথাটা নুইয়ে দেয় লক্ষ্মীকান্তর পায়ের ওপর।

থাক থাক। দু পা পিছিয়ে যায় লক্ষ্মীকান্ত। তার পর কী করছো আজকাল? বুকের পাঁজরাগুলো তো দিন দিন ঠেলে আসছে সামনের দিকে।

আজ একমাস ধরে চালের মুখ দেখি নি, ঠাকুরমশাই। ডাঁটাশাক আর কচু সেদ্ধ খেয়ে বেঁচে আছি এ্যাদ্দিন। ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলে বিপিন।

চেহারা দেখেই তা বুঝতে পেরেছি। লক্ষীকান্ত উত্তর দেয়। কিন্তু তোমার-তো পান বিড়ির দোকান ছিল সেটা কী তুলে দিয়েছ নাকি?

দোকান! ভূতের মতন হাসে বিপিন। দোকান কী আর আমি তুলে দিইছি। আপনিই উঠে গেল ধীরে-ধীরে। ভুষণার মা ঠিক পাশটিতে দোকান করল আমার। আর কী লোক আসে আমার দোকানে? পাশের দোকানে পানও মেলে—রাঙা ঠোঁটে হাসি মস্করাও চলে। এমনই কারবার ঠাকুরমশাই, মেয়েলোকের কারবারই এমনি।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে লক্ষীকান্ত। বঙ্কুও তাকিয়ে থাকে মাঠের দিকে। খাঁ খাঁ করে আউস ধান কাটা শূন্য মাঠগুলো। দিগন্তব্যাপী মাঠ আলের বাধা পেয়ে পেয়ে ছড়িয়ে পড়েছে হাজার টুকরোয়।

বিপিনই কথা বলে—সেদিন ছোট বাবুদের বাগানে কলা নেয়ার লেগে গেছলাম, ঠাকুরমশাই। শেষকালে ধরে ফেলে লাঠি মেরে খোঁড়া করে দিল পা-টা। ঈস্ কাঁদিটার কী সোনালি রং!

লক্ষীকান্ত একবার বিপিনের নোংরা নেকড়া-বাঁধা পায়ের দিকে নজর দেয়। তার পর তার চোখ পড়ে খোঁচা খোঁচা দাড়ির দিকে। বয়স হয়েছে বিপিনের। নইলে একবার প্রস্তাব করে দেখতো সে। বিপিনও খেয়ে বাঁচতো। লক্ষীকান্তর পকেটেও আসত কয়েকটা টাকা।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করে লক্ষীকান্ত—তার পর এখন কী করবে ঠিক করেছো?

আমি আর এখানে থাকব নি ঠাকুরমশাই। গদাই আর বিষ্টু কাল সকালে চলে যেতেছে মাগ ছেলে নে। আমিও চলে যাবো তাদের

সাথে। আসামে নাকি শস্তায় চাল ডাল মেলে। সেখানে গেলে এক আধটা চাকরি বাকরি মিলেই যাবে। কী বলেন ঠাকুরমশাই। এখানে বসে থেকে মরতে পারব নি কিন্তুক।

ষাট, ষাট। মরতে যাবে কেন? তোমরা বেঁচে বর্তে উঠলেই তো দেশের মঙ্গল। লক্ষ্মীকান্ত সামনের দিকে পা বাড়াতে চেষ্টা করেন।

চলে যান নাকি, ঠাকুরমশাই। দাঁড়ান দাঁড়ান, গড় করি আপনাকে। বিপিন পথ আটকায়।

বিপিন কাছে যেতেই পিছিয়ে যায় লক্ষ্মীকান্ত। বলে, হয়েছে হয়েছে। যেথানেই যাও সাবধানে থেকো কিন্তু।

লক্ষ্মীকান্ত আর বন্ধু চলতে আরম্ভ করে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। ঢাকের আওয়াজও থেমে গেছে বিপিনের কথা শুনে।

রাশিকৃত ধুলোর সমুদ্র মন্থন করে যেতে যেতে লক্ষ্মীকান্ত কিন্তু অন্য কথা ভাবে। তার স্ত্রী হয়ত এতক্ষণে জন্ম দিয়েছে নতুন সন্তানের। ছ জনের সারিতে আবার একজন নতুন আগন্তুক। লক্ষ্মীকান্তর ভালোবাসা যেন কড়ায় গণ্ডায় ফিরিয়ে দিচ্ছে তার স্ত্রী!

মহকুমার ডাকবাংলো। বাড়ীর চারপাশে সবুজ মাঠ। সামনের দিকে চওড়া লাল কাঁকরের রাস্তা। বাগানের কোনো কোনো কেয়ারিতে ফুল গাছ। পাম গাছের টবগুলো এদিক ওদিক বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো। শরৎ-কালের রোদ দূরের বাঁশ গাছ ভেদ করে তেরছাভাবে ঘাসের ওপর এসে পড়েছে। ঘাসের মধ্যে শিশিরের ভিজে-ভিজে ভাব। লোকজন ভোর থেকে এসে জমা হতে শুরু করেছে। আজ যেন তাদের বিচার সব, এমনি ধরনের অনেকের মুখের ভাব। থানা থেকে খাকি পোষাক পরা সেপাই

এসে মোতায়েন হয়েছে ডাকবাংলোর চারদিকে। দারোগাবাবু সামনের দিককার চত্বরে বসে বিড়ি টানছে।

এমন একটা পরিবেশের মধ্যে লক্ষ্মীকান্ত একটা পাতলা চাদর গায়ে দিয়ে এসে হাজির হয়। আসামাত্র তাকে ঘিরে ধরে লোকজনেরা।

আমায় ছেড়ে দেন ঠাকুরমশাই। আপনার পায়ে ধরছি আমায় ছেড়ে দেন। গ্রাম ছেড়ে আমি কোথাও যাব নি। হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠে ভৈরবী ডোমের ছেলে।

পুরুত মশাই, দোহাই আপনার, আমার ছেলেটাকে নিয়ে যাবেন না। টাকার কথা শুনে খাতায় নাম লিখিয়েছে হারামজাদা। বেইমান, এতদিন খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলাম, এই বুঝি তার ফল। কুবের রাগের মাথায় ছেলেটার গালে সজোরে চড় মারে।—মাইরি, ভগবানের কিরে, ছোঁড়াটা চলে গেলে পোয়াতি বউটা গলায় দড়ি দিয়ে মরবে।

আমার মানিক, ঠাকুরমশাই। আমার মানিক। রামলালের বুড়ী ঠাকুরমা কাটা ছাগলের মতন লক্ষ্মীকান্তের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে। বাছাকে নিয়ে গেলে আমি কিন্তু দু দিনও বাঁচবো না। ও আমার চোখের মানিক, ঠাকুরমশাই। ও চলে গেলে সারা পিথিমী অন্ধকার হয়ে যাবে।

ভয়ে, লজ্জায় ও দুঃখে লক্ষ্মীকান্ত কয়েক পা পিছিয়ে যায়। দু দিন আগেই তো এরা এগিয়ে এসেছিল তার ডাকে। আজ হঠাৎ পিছু হটছে কেন? লক্ষ্মীকান্ত নিজের মনকে প্রশ্ন করে। গ্রামের অত্যন্ত দরিদ্র জীব এরা অথচ নতুনতর জীবনের আস্বাদ নিতে এত ভয় কিসের?

নির্মম ফাঁকিটা ধীরে ধীরে ধরা পড়ে লক্ষ্মীকান্তের মনে। টাকা আর দেশপ্রেম! কে যেন গণ্ডী রচনা করে আলাদা করে দিয়েছে দুটো জিনিস। লক্ষ্মীকান্ত তাদের দেখিয়েছে টাকার লোভ।

লক্ষীকান্ত পাথরের মতন দাঁড়িয়ে থাকে ভীড়ের মধ্যে। এরফান, এনায়েৎ, ত্রিদিব, ওসমান, দ্বারিক সবাই এসে পড়েছে একে একে। শুধু তারা একলাই আসে নি। সঙ্গে এনেছে তাদের পরিবারের সমস্ত লোক।

রামলালের ঠাকুরমাকে চিৎকার কর্তে শুনে সেপাইরা দৌড়ে আসে তার কাছে। একজন বলে—চুপ কর, হারামজাদী মাগী। বেশী চেঁচাবি তো ঐ হাড় ক খানা লাঠি দিয়ে গুঁড়ো করে দেব।

আরো জোরে আর্তনাদ করে কেঁদে ওঠে বুড়ী।

ফের। ফের আবার। সেপাইটা লাঠি তোলে মাথার ওপর।

যন্ত্রের মতন এগিয়ে এসে লক্ষীকান্ত বলে—থাক থাক। ও আপনা থেকেই চুপ করে যাবে।

বিকৃত মুখভঙ্গী করে সেপাইটা নিঃশব্দ শাসানি জানিয়ে চলে যায়।

বিড়ি টানতে টানতে রামলাল বলে—যা, যা, বুড়ী! বাড়ী যা। বিদেশে গিয়ে তোর জন্তে অনেক টাকা পাঠাব, বুঝলি।

বুড়ী বিমূঢ় হয়ে চেয়ে থাকে নাতির দিকে। এমনি করে ত্রিশ বছর আগেও তার এক ছেলে তাকে প্রবোধ দিয়ে হাতের নাগাল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের ময়দানে না কোথায়! বুড়ী আজও তার ঠিকানা পায় নি। হয়ত বন্দুকের গুলীতে লড়াইয়ের মাঠেই সে মরে ভূত হয়ে গেছে।

প্রাতরাশ সেরে ডাকবাংলো থেকে কয়েকজন সরকারী কর্মচারী বেরিয়ে আসে। তার পর শুরু হয় পরীক্ষার কাজ। লোকগুলো শিরদাঁড়া খাড়া করে তটস্থ হয়ে দাঁড়ায়। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ডাক্তারী পরীক্ষা হয়ে চলে একটার পর একটা। ভয়ে পিছিয়ে যায় অনেকে। আর্তনাদ করে কেঁদে ওঠে কেউ কেউ। প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কারো কারো জিব

অসাড় হয়ে যায়। কর্মচারীরা শান্ত। মাঝে মাঝে করুণার হাসি হাসে। সেপাইগুলো খবরদারি করে মেরুদণ্ড খাড়া করে।

লক্ষীকান্ত ঘাসের ওপর বসে থাকে চুপ মেরে। রাস্তার ধারে খানসামার আদুরে কুকুরটা হাড় খায় চিবিয়ে চিবিয়ে। লক্ষীকান্তর কিন্তু সেদিকেও দৃষ্টি নেই। তার দৃষ্টি আকাশের দিকে। সূর্যের আলো এসে পড়ছে বাঁশ গাছে আর সেখান থেকে তা তির্যকভাবে এসে পড়ছে ঘাসের ওপর। শীতকালের হলদে রোদকে লক্ষীকান্তর লুফে নিতে ইচ্ছে যায়।

হঠাৎ হৈ চৈ শোনা যায়। দারোগাবাবু কুবেরের কচি ছেলেটাকে প্রহার করে লাঠি দিয়ে। কুবের অসহায়ভাবে আর পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। কাছে গিয়ে নিষ্ঠুরতার রাশ টেনে ধরতে সাহস হয় না। বঙ্কু একটা গাছের নীচে বসে মনের আনন্দে বিড়ি টানে আর মাঝে মাঝে বলে—ঢং দেখো না। খাতায় নাম লিখিয়ে এখন কেটে পড়বার তালে আছে।

এক সময়ে কুবের বঙ্কুর পাশে এসে বসে। হাউ মাউ করে কাঁদে কপালে হাত দিয়ে। বলে—আমার কি হবে বঙ্কু ভাই। বউটা ঠিক গলায় দড়ি দিয়ে মরবে কিন্তু।

বঙ্কু বিজ্ঞের মতন বলে—যা যা সময় থাকতে কেটে পড় কুবীর, নইলে ওরা দেখতে পেলে আর পালাবারও পথ পাবি না।

সকাল থেকে দুপুর। সমস্ত সময়টা এমনিভাবে বেরিয়ে যায়। চুয়াল্লিশজন লোক থেকে বাছাই করা হয় মাত্র বত্রিশজনকে। বারোজন নিস্কৃতি পায়। তিনজনের হাঁপানি রোগ, সাতজন ক্ষীণদেহ, দুজনের বয়স হয়েছে। হাঁপানি রোগী বলে রামলাল মুক্তি পায় যুদ্ধযাত্রা থেকে। রাগে গজ গজ কর্তে কর্তে রামলাল বুড়ী ঠাকুমাকে লাথি মারে। বলে

—তুই আমার শনি। আমার কালি। যেখানে যাবি সেখানে বাড়া ভাতে ছাই দিবি।

দৃশ্য দেখে চোখ ফিরিয়ে নেয় লক্ষীকান্ত। শীতের সূর্য পশ্চিম দিকে কাঁচা সোনার মতন গলে পড়েছে। লাল কাঁকরের সড়ক ডিঙিয়ে সেপাইরা এগিয়ে নিয়ে চলেছে বত্রিশজনের একটা মিছিল। সামনেই রেলওয়ে ইয়ার্ডে ইঞ্জিনের শব্দ। মাঠটা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে বললে চলে। শুধু রাস্তার এক ধারে বসে বসে কুবের মাথায় হাত দিয়ে কাঁদছে।

লক্ষীকান্ত ষ্টেশনের দিকে তার চোখ দুটো প্রসারিত করে দেয়। যত রাজ্যের এলোমেলো চিন্তার ঝড় তার মাথার মধ্যে।

এই বত্রিশজনের শীর্ণ মিছিল কি জানে যে তারা এক দিন মুক্তির ধ্বজা তুলে ফিরে আসবে তাদের দেশে ?

পরোয়ানা

শহরের উপকণ্ঠে ছোট ছোট হিজিবিজি টিনের চালা আর খোলার ঘর। টিনগুলো মরচে পড়া। চিনতে কষ্ট হয়। খোলার চাল- মাঝে মাঝে ঝুলে পড়েছে মাঝখান থেকে। তার ওপর গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে লতানে ফুল গাছ। অনেকের চালে লাউ কুমড়োর গাছও চোখে পড়ে। ঘর দোরের বিচিত্র দৈন্য যেন প্রকৃতির সৌন্দর্যে চাপা পড়ে গেছে। দাঁত বের করা হাঙরের চেহারা রাতারাতি শ্রীময়ী হয়ে উঠেছে সবুজের প্রলেপ পেয়ে।

তবু ভালো। বংশী দাঁত বের করে হাসে আর নিড়ানি দিয়ে মাটি কাটে। মুঠো মুঠো সার দেয় তার গাছের গোড়ায় ভালো ফল পাবার আশায়। কিন্তু ফল হয় না। বড় জোর ফুল ফোটে। ফল ধরতে না ধরতেই আবার ঝরে যায়।

বংশী প্রত্যেক বার কৈফিয়ৎ আদায়ের ভঙ্গীতে যশোদার মুখের দিকে তাকায়। বলে—এবারও ঝরে গেল। নিশ্চয়ই নজর দিয়েছে কেউ।

সারাটা দিন ঘরে থাকিস। একবার দেখতে পারিস না কে কি তুকতাক্ করল।

ওমা! কে আবার তুকতাক্ করতে গেল তোমার কুমড়ো গাছে? খেয়ে দেয়ে তো আর কারও কোনো কাজ নেই।

নেইই তো। রাগে ফেটে পড়ে বংশী।—নইলে সবার গাছে ফল ধরে। আর আমার বেলাই ঝরে যায় পেত্যেক বার। দিক দেখি কেউ অত সার গাছের গোড়ায়?

বিজ্ঞের মতন যশোদা বলে—হবে না? বাঁজা গাছে ফল ধরে কোনো দিন? এই তো দু বছর হল। কানাই তার পেঁপে গাছটার কি যত্ন আত্যিই না করছে। কিন্তু ফল আর হয় না। ফুল ধরতে না ধরতেই ঝরে যায়। তা বাঁজা গাছ লাগিয়েছো যখন—

বাঁজা! যশোদাকে কথা শেষ কর্তে দেয় না বংশী। নিজের মনেই কি যেন বিড় বিড় করে। তার পর চিৎকার করে বলে—ঠিক বলেছিস, তোর মতনই বাঁজা। ফুল ধরে অথচ ফল হয় না। রাগে নিড়ানিটা বংশী টিনের চালার ওপর ছুঁড়ে দেয়। মরচে পড়া টিনে ঝন্ ঝন্ করে শব্দ হয়। যশোদা আঁচলটা টেনে নিয়ে ঘরে গিয়ে ওঠে। গোবর দিয়ে নিকোনো জমির ওপর হাতুড়ির মতন বেজে ওঠে তার গোড়ালি দুটো।

বাস্তুটা আজকের নয়। অনেক দিনের পুরোনো। তিন পুরুষ ধরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে আজকের এই অবস্থায় এসে পৌচেছে। পাঁচ মাইল দূরে প্রকাণ্ড পাট কল। সেখানে বস্তির অনেকেই কাজ কর্তে যায়। আবার কেউ যায় লোহা কলে, ওষুধের কারখানায়, নতুন বিমান ঘাঁটিতে। বস্তির মেয়েদের অধিকাংশই মজুরী কর্তে বিমান ঘাঁটিতে যায়। মাটি

কাটে, মাটি বয়। বিদেশী সৈন্যরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। বেছে বেছে ছবি তোলে ক্যামেরা দিয়ে। দু একজন তাদের সুনজরেও পড়ে যায়। কপাল খুলে যায় রাতারাতি। হাতের নীচে করকরে টাকা চেপে বাড়ী ফিরে আসে। দীর্ঘজীবি হোক যুদ্ধ! অসন্তোষের কালো ধোঁয়ার মধ্যেও কারা যেন ভগবানের কাছে যুদ্ধের দীর্ঘায়ু কামনা করে।

তবু বংশীর যেন কোনো দিকে হুঁস নেই। দশজনের মধ্যে বাস করেও সে সব থেকে আলাদা। ভোর হতে না হতেই পাট কলের বাঁশী বেজে ওঠে। সাবধান করে দিয়ে যায় সবাইকে। হুড়মুড় করে বস্তি ছেড়ে মেয়ে পুরুষ বেরিয়ে পড়ে কারখানার উদ্দেশ্যে। কেউ দৌড়োয়, কেউ খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে, কেউবা সা[illegible] করে যায়। রাস্তায় যেতে যেতে জানকীপ্রসাদের বিধবা মেয়েটার [illegible] মস্করা করে রামলাল। প্রাণের কথা বলে, পান খাওয়ায়। চোখ টা[illegible] সবার। কিন্তু কেউ কথা বলতে সাহস করে না। রামলালের ছাতির দিকে তাকিয়ে ভয়ে পিছিয়ে যায় লোকেরা। ছেচল্লিশ ইঞ্চি ছাতি, চোখ দুটো জবা ফুলের মতন লাল। বিলাসিয়া কোয়ারার মতন হাসে। আর সকলের কানে তা হাতুড়ির বাড়ির মতন শোনায়।

বস্তি খালি হয়ে যায়। বংশী তবু পড়ে পড়ে ঘুমোয়। তার হাজিরা হল নটায়। খালের ধারে রায়েদের ওষুধের কারখানা। বংশীর কাজ হল বোতলে লেবেল আঁটা। সকাল থেকে বিকেল। ছ বছর ধরে বংশী সমানে লেবেল এঁটে আসছে। যা মাইনে পায় তাতে দুটি প্রাণীর কোনো রকমে চলে। তবু বংশী স্ত্রীকে কাজে পাঠায় না। তার সম্মানে বাধে। বস্তির অনেক মেয়েই কাজ করে। কিন্তু যশোদা যেন তাদের থেকে ভিন্ন। সে বাড়ীতে পড়ে পড়ে ঘুমোয় নয়তো বাগানে

জল দেয়, বিচি পোতে, লতানেগুলো তুলে দেয় চালার ওপর। অবসর সময়ে বস্তির ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেলা করে।

একদিন বংশী ফেরার সময়ে একটা রঙীন ওষুধের শিশি সঙ্গে করে আনে। আজ তার মন মেজাজই অন্য রকম। যশোদাকে বলে—এই নে, তোর জন্যে এই ওষুধ বাবুরা আধা দামে দিল। এই এক বোতলেই ফল হবে। রোজ একবার করে খাবি।

রাগ করে যশোদা বলে—ফল যা হবে তা জানাই আছে। এ পর্যন্ত তো কতই হল। তার চেয়ে কুমড়ো গাছের গোড়ায় ঢেলে দাও ওষুধটা। ফল ধরবে মনের মতন।

বংশী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে। যশোদাকে ধরতে গেলে সে হাতের নাগাল থেকে বেরিয়ে যায়। রাগে ও লজ্জায় থম থম করে তার মুখখানা। ওষুধের বোতলটা কুলুংগীতে রেখে নিড়ানি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায় বংশী। বেগুনের চারাগুলো বেড়ে উঠেছে কেয়ারিতে।

রায়েদের কারখানা থেকে বংশী প্রায় ওষুধপত্র এনে বস্তির লোকেদের দেয়। সবাই জানে বংশী থাকতে কারো ভাবনা নেই। রোগীর যে করে হোক একটা ব্যবস্থা হবেই। পয়সায়—বিনে পয়সায় যখন যেমন সুবিধে সে নানান রঙের বোতলে রংচঙে ওষুধ নিয়ে আসে। লোকেরা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে নানা রকম প্রয়াস পায়। ঘরের দাওয়ায় এসে বিড়ি খাওয়ায়, যশোদার সঙ্গে হেসে আলাপ জমাবার চেষ্টা করে। পৃথিবী, মানুষ, জীবনদর্শন, কত রকমের নীতিকথা দিয়ে বংশীর জীবনকে ভাবিয়ে তুলতে পরিশ্রম করে। বংশী আত্মপ্রসাদে কেঁপে উঠে যশোদাকে বলে—দেখলি, জগন্নাথ বুড়ো কী বলল শুনেছিস—যার বংশী নেই তার কেউ নেই।

ঈস্ কী কাজের মানুষ রে! যশোদা ভেংচী কেটে চলে যায়।

বংশীর জীবনের পরিধি অনেক ছোট। তার বস্তি ছাড়িয়ে সে বড় জোর রায়েদের ওষুধের কারখানার কথা চিন্তা কর্তে পারে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। পাঁচ মাইল দূরের প্রকাণ্ড পাট কল, তার আকাশছোঁয়া চিমনি, যন্ত্রের গর্জন, শ্রমজীবিদের আর্তি, মিল মালিককের হাল ফ্যাসানের তিন রঙা মোটর গাড়ী—এ সব কথা তার মনের কাছে শুধু ভীড় করে। ভীড়ই করে, মনের মধ্যে খুঁটি গাড়ে না। তার চেয়ে সে ভালো বোঝে তার ঘরের মাচার নিস্ফলন্ত কুমড়ো গাছকে। হাজার সার দিয়েও তার ফুলে ফল ধরে না। তার চেয়েও সে ভালো করে বোঝে তার স্ত্রীকে। সেবায় যত্নে যশোদা তাকে ভরে দিয়েছে। অথচ আজও একটা সন্তানের জন্ম দিতে পারে নি। কথাটা মনে কর্তেই লজ্জায় ও ঘৃণায় যশোদাও এতটুকু হয়ে যায়। মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে করে মুহূর্তের জন্যে। জীবনের কত বিকৃত জটিলতা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওঠে তাকে কেন্দ্র করে। তবু বংশী এক রকম সুখী। জীবনের অসংখ্য গ্লানি ও অভাবের মধ্যেও সে তার সমস্ত মাধুর্য নিয়ে বেঁচে আছে। রামলালের মতন নয়। রামলাল মদ খায়; বিলাসিয়ার সঙ্গে ইনিয়ে বিনিয়ে প্রেম করে, রাতের বেলা স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দেয় কোনো কোনো দিন, টাকা ধার নিয়ে শোধ দেয় না।

এমনি অবস্থার মধ্যেই দিন কাটে। হাজার উপদ্রব, হাজার অভাব অভিযোগ। মানুষ যেন মানুষ নেই। যুদ্ধের ফলে আরো দ্রুত গতিতে বেড়ে চলে সমস্ত অসঙ্গতি। আগের তুলনায় মোটা মোটা টাকা আসে লোকের হাতে। সব সময়ে তবু 'নেই নেই' ভাব। টাকার প্রকাণ্ড ময়ুরপঙ্খীটা যেন ফুটো হয়ে গেছে মাঝ দরিয়ায় গিয়ে। বানের জল ঢুকছে হু হু করে। এমনি দাঁড়িয়েছে সংসার। বংশীর সঙ্গেও তার প্রতিবেশীদের যেন সে সদ্ভাব নেই।

কেউ কেউ একৃসট্রা কাজ করে, ডব্‌ল শিফ্‌ট খাটে। সপ্তাহ শেষে পকেটে ঝন্‌ ঝন্‌ করে পয়সা। জুয়ো খেলা বাড়ে, খালের ধারের পচাইয়ের দোকানে ভীড় জমে, বাতাসীর চাটের দোকানে হল্লা হয়। আবার কেউ কেউ সারাদিন খেটেখুটে ফিরে আসে। রক্ত ওঠে মুখ দিয়ে। বুকের ভেতর ফুসফুস দুটো যেন বন্ধ হয়ে আসতে চায়। চিকিৎসার পয়সা নেই। দুধ নেই। কচি ছেলেটা কাতরায় মার বুকে। রিক্ত হাতে লোহার তামাটে নোয়াটা চিক্‌ চিক্‌ করে।

যারা পচাইয়ের দোকানে ভীড় করে আর যাদের মুখে রক্ত ওঠে, তাদের সবাইকে খুব ভালো করেই চেনে বংশী। একজন আরেকজন থেকে আলাদা। মনের মিল, মতের মিল, জীবনের মিল দমকা হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে গেছে চারদিকে।

তাই বংশী হঠাৎ একদিন সাবধান করে দেয় যশোদাকে যাতে সে আর বস্তির মেয়েদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা না করে। পাট কল ছেড়ে মেয়েরা বিমান ঘাঁটিতে যাচ্ছে দলে দলে। সেখানে নাকি বেশী অর্থোপায় হয়। জীবনের হাজার অভাব অভিযোগের দেউড়ী পেরিয়ে তারা যেন নতুন জীবনের আস্বাদ পেয়েছে। বিলাসিয়া পর্যন্ত পাট কলে ইস্তফা দিয়ে বিমান ঘাঁটিতে যায়। নীল চুমকি বসানো হাওয়াই শাড়ি, টকটকে লাল রঙের সেমিজ, মুখে খড়িমাটির প্রলেপ, পায়ে মলমলের সবুজ জুতো। পক্ষাঘাতগ্রস্ত জান্‌কীপ্রসাদ ঘরে বসে বসে কুৎসিত গাল দেয়। তার চরিত্রের ওপর কশাঘাত করে। বিলাসিয়া জবাব দেয় না কোনো কথার। পায়ের ওপর ভর করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় নিঃশব্দে। রামলালকে দেখলে পর্যন্ত মুখ ফিরিয়ে নেয়। যেন চেনেই না। রামলাল যেন আর কাউকে একদিন দেহের উত্তাপ দিয়ে ভালবেসেছিল—বিলাসিয়াকে নয়।

কোনো এক মার্কিন সৈন্য নাকি রঙীন ছবি তুলে দিয়েছে বিলাসিয়াকে। বিলাসিয়া সব সময়ে সেই ছবিটা হাতে করে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে তন্ময় হয়ে বিলাসিয়া নিজের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে—সে কী সত্যিই এত সুন্দর!

বংশী চিন্তিত হয়ে স্ত্রীকে বলে—স্বভাব চরিত্তির বলে আর কিছু থাকল না এই বস্তিতে, বুঝলি যশোদা। মেয়েরা সৈন্যদের কাছে সতীত্ব বেঁচে আসছে গিয়ে গিয়ে। পাট কলে কাজ করে পেট ভরে না, তাই ঘাঁটিতে যাচ্ছে সব মেয়ে পুরুষ।

ভয়ে কাঠ হয়ে যায় যশোদা। বংশী বলে—সেখানেও সৈন্যরা বেইজ্জৎ করছে মেয়েদের। তাদের বিশ্রী রোগগুলো নিয়ে আসছে।

করবে না? খুব করবে। রাগে গজ্ গজ্ করে জগন্নাথ। টাকার বদলে সতীত্ব খুইয়ে আসছে মেয়েগুলো! এই তো এখনই শুনে এলাম রামলালের কাছে। বস্তিময় টি টি পড়ে গেছে কথাটা নিয়ে। মাখনের বউ এক সাহেবের ছেলে বিইয়েছে কাল রাত্তিরে। ঐ তো কালো কুৎসিত চেহারা মাখনের। বউটার চেহারাই বা এমন কী ভালো কিন্তু ছেলেটা খাঁটি সাহেবের ঘরের। এই সব দেখে শুনে আজ সকালেই মাখন বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে। বল, এর পর কী বলতে চাও?

লজ্জায় ও ঘৃণায় মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ঘরের ভেতর চলে যায় যশোদা। ঐ মাখনের বউয়ের সঙ্গেই একদিন যশোদা সই পাতিয়েছিল।

বংশীর অপ্রশস্ত মন চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে রীতিমত। বলে—শেষকালে মাখনের কচি বউটা পর্যন্ত এই করল?

না করে কী করবে বল? মাখন চাকরী গিয়ে ছ মাস ঘরে বসেছিল বেকার। স্বামী স্ত্রী দুজনেই লাইনে দাঁড়িয়ে চাল ডাল সংগ্রহ করতো। ওই ফাঁকে বউটা এ পথে নামলো। বাঙালীর ঘরে সাহেবের ছেলে!

মানুষ কতদূর নীচে নেমে গেছে বলতে পারো? এই মানুষ জাতটা উচ্ছনে যাবে তোমায় বলে দিলাম বংশী। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ আর মড়কে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে ঘর সংসার!
শেষ পর্যন্ত তোমার মুখেও এই কথা জগাদা। এবার সত্যি সত্যিই কেঁদে ফেলে বংশী।
কথাগুলো বংশী অত্যন্ত নাটকীয় সুরে উচ্চারণ করে। হাসতে হাসতে জগন্নাথ তার মাংসল হাতটা বংশীর পিঠের ওপর তুলে দেয়। বুকের কাছে টেনে নেয় তাকে। বংশীকে কত ছোট কত অসহায় মনে হয় মুহূর্তে!

কয়লা নেই। পাট কল বন্ধ হয়ে যায় একদিন। চিমনিতে ধোঁয়া দেখা যায় না। মনে হয় বাঁশী যেন কতদিন বোবা হয়ে গেছে। বস্তির ছেলেমেয়েরা দলবেঁধে কন্ট্রোলের দোকানে চাল আনতে বেরোয়। চাল নেই। দুটো দোকানে রাতারাতি তালা পড়ে। কেউ কেউ উস্কানি দেয়—ভাঙো। ভেঙে ফেলো তালা। যে সরকার প্রজাদের অন্ন জোগাতে পারে না, উচ্ছনে যাক সে সরকার।
যাবে। উচ্ছন্নে যাবে একদিন, একথা সবাই মনে মনে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে আনন্দ পায়। নতুন বিমান ঘাঁটিতে হানা দেয় অনেকে চাকরীর আশায়। মেয়েরা অনায়াসে কাজ পায়। পুরুষদের কপালে কয়েকটি জোটে মাত্র, তাও অস্থায়ী। জগন্নাথকে ডেকে কনট্রাকটারের লোকেরা বলে—আসলে কথা কি জানো, মেয়েরাই এই কাজ ভালো পারে। তার ওপর মাইনেও কম। মর্মান্তিক হাসি হাসে জগন্নাথ। হাসতে হাসতে তার চোয়াল দুটো ঝুলে পড়ে অসহায়ভাবে। তার

নিজেরই ওপর করুণা হয় জগন্নাথের। প্রকাণ্ড পরিহাসের ঘূর্ণির মাঝখানে সে কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ায়। তার পর বংশীকে বলে—আমাকে একটা কাজ জুটিয়ে দাও তোমার ওষুধের কারখানায় বংশী।

দু দিন সবুর করো, পাট কল চলতে আরম্ভ করলে তো আবার পুরো হপ্তার মাইনে পাবে।

ও কারখানার বাঁশী আর বাজবে না, এই তোমায় বলে দিলাম বংশী। ওদের ওপর আর কোনো ভরসা রাখি না। সর্দার বললো, কয়লা আসতে আস্তে দু মাস লাগবে। তার ওপর জমির মালিক নোটিশ দিয়েছে—ঐ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে এক হপ্তার মধ্যে। পাট কলের নতুন ম্যানেজারের আপিস তৈরী হবে এখানে।

অ্যাঁ, তাই নাকি! বংশীকে অত্যন্ত ভয়ার্ত মনে হয়।—এক সপ্তাহের মধ্যে? বল কী জগাদা, এই বস্তি ছেড়ে যাবো কোথায়?

যেখানে ইচ্ছে। তারা তার কী জানে? সর্দার বললো আজকের মধ্যে নোটিশ দিয়ে যাবে ঘরে ঘরে। ঢেঁড়া পিটে দিয়ে যাবে মালিকের লোকেরা। জগন্নাথের চোয়ালের মাংস করুণ হাসিতে কুঁচকে ওঠে।

তুমি কী বলতে চাও জগাদা? তিন পুরুষ ধরে বাস করছি এই জমিতে। আজ মালিকের খেয়াল মাফিক জমি ছেড়ে চলে যেতে হবে রাতারাতি। এই এত ঘর মানুষ, টুঁ শব্দ না করে চলে যাবে বলতে চাও?

না গিয়ে উপায়? এই মানুষ তাদের সামনে আর কতটুকু? পুলিশ আসবে, ফৌজ আসবে তোমাকে উৎখাত কর্তে। দেখতে দেখতে সব লোক ছত্রখান হয়ে যাবে চারদিকে।

এই লোক কিছু কম বলে তুমি মনে কর জগাদা? বংশীর চোখ দুটো এক মুহূর্তে বড় হয়ে ওঠে।

না হয় তোমার কথাই মানলাম বংশী কিন্তু এই হাজার মানুষকে

বাঁধতে পারো এক তারে—তবে বুঝি তার শক্তি। নইলে ভাঙা ভাঙা দল, কোন্‌দিকে ভেসে যাবে তার ঠিক কী?
বংশী জবাব দেয় না। তার চোখের সামনে এলোমেলো চালা ঘরের বিশৃংখল জটলা। সে দিকে সে এক মনে তাকিয়ে থাকে। সাত দিন পরে এ সব একেবারে মুছে যাবে চোখের সামনে থেকে। ভয়ে তার বুকের ভেতরটা যন্ত্রের মতন কেঁপে ওঠে।

এক সপ্তাহ।
পরোয়ানা মাফিক কাজ হয়ে চলে দ্রুতগতিতে। মাটির চালা খালি হয়ে যায়। ঘরের সামনে জমা হয় ছোট ছোট নোংরার স্তূপ। গরুর গাড়ী আসে। আবার মাল বোঝাই হয়ে ধুলো রাঙা হলুদ পথ ভেঙে অদৃশ্য হয়ে যায়। তার ঘরের দাওয়ায় পড়ে পড়ে জানকীপ্রসাদ কাঁদে চিৎকার করে। বুড়ো বাপকে ফেলে বিলাসিয়া নাকি কোনো এক নীগ্রো সৈন্যের সঙ্গে চলে গেছে কয়েক দিন হল। মাখন ফিরে আসে না। মাখনের বউও সেই ফাঁকে নিখোঁজ হয়। খবর পাওয়া যায় না কোথাও। কোলের ছেলেটা কাতরায় পড়ে পড়ে। বিষ্ণুপদর ঘরেও তালা দেয়া। স্ত্রী আর তার বোবা মেয়েটাকে নিয়ে সে শহরের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে জীবিকার খোঁজে। রামলাল জ্বরে বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকে। জানিয়ে দেয় সে এ জমি ছেড়ে এক পাও নড়বে না। আসুক পুলিশ, আসুক ফৌজ। সে তার ছেচল্লিশ ইঞ্চি ছাতি নিয়ে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। রামলালের রুগ্না স্ত্রী স্বামীর পাশে বসে প্রাণপণ সেবা করে আর মাঝে মাঝে ডুকরে ডুকরে কাঁদে তাদের অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভেবে। জগন্নাথ তার বুড়ী মাকে প্রবোধ

দেয়—অনর্থক চোখের জল ফেলে কী করবে? ব্যবস্থা একটা হয়েই যাবে থাকবার। না হয় পথের মাঝখানেই থাকবো। সমস্ত জীবনটা কী আর রাজপ্রাসাদে বসে কাটিয়েছ যে আজ পথে নামতে বুক কাঁপছে? জগন্নাথের শেষ কথা কয়টা কান্নার মতন শোনায়। যাট বছরের অন্ধ বুড়ী ছেলের কথায় কান দেয় না। ডুকরে ডুকরে কাঁদে আর ভগবানকে ডাকে। অভিশাপ দেয় বস্তির মালিককে।—দেখে নিস উৎখাত হয়ে যাবে মুখপোড়া মিন্‌সের সংসার। এক এক করে মরে যাবে ছেলে কটা। নির্বংশ হয়ে যাবে একেবারে। শকুন চরে বেড়াবে মিন্‌সের ভিটেয়। এই মা কালীর পট ছুঁয়ে আমি শাপ দিচ্ছি জগা, ঐ পোড়ার-মুখো ড্যাকরার মুখে আগুন দেয়ার কেউ থাকবে না। বুড়ীর কথার সঙ্গে সঙ্গে তার বিবর্ণ চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসে। জগন্নাথ বুড়ীর কথার উত্তর না দিয়ে জিনিসপত্র গোছাতে থাকে। মাটির হাঁড়ি কলসী সরিয়ে দেয় দূরে। কে নিয়ে যাবে বাড়ে করে এই সব জঞ্জাল।
এক সময়ে রামকিংকরের হাবা মেয়েটা দরজার কাছে এসে পিট পিট করে তাকিয়ে থাকে জগন্নাথের দিকে। তারপর থেমে থেমে বলে—জগাকাকা, বাবা একটা ছেঁড়া কাপড় চেয়ে পাঠিয়েছে। যে কোনো একটা ধুতি শাড়ি হলেই হবে। বাসনপত্র বাঁধতে হবে।
দূর পাগলী! নিজেরই বলে পরার কাপড় নেই। তার আবার বাসন বাঁধবার কাপড়।
মেয়েটি অসহায়ভাবে বলে—দিন না একটা কাপড়। বাবা বলল জগাকাকা চাইলেই দেবে।
হঠাৎ জগন্নাথের মনে পড়ে যায় রামকিংকরের বউয়ের কথা। ক দিন হল কাপড়ের অভাবে কাজে বেরোয় নি সাবিত্রী। বাসনপত্র বাজে কথা। কাপড়টা দরকার সাবিত্রীর নিজের জন্যে। একখানা

যশোদা স্বামীর মুখের দিকে দেখে হাসে। তার পর বলে—তাছাড়া তুমিও তো চেয়েছিলে এমনি একটা ছেলে। চাও নি?

উত্তর দেয় না বংশী। চুপ করে বোবার মতন দাঁড়িয়ে থাকে। সত্যিই সে একটা ছেলে চেয়েছিল। কিন্তু হয়ত এ রকম নয়। এর চেয়েও —এর চেয়েও কুৎসিত।

একটু পরে জগন্নাথ আসে। সঙ্গে তার অন্ধ মা আর ময়লা কাপড়ের পুঁটলিতে বাঁধা সংসারের যাবতীয় জিনিস। দুজনেই ঘন ঘন চোখ মোছে। মাটির প্রতি মায়া হয়। মমতা হয় নিজেদের ওপর। পূর্বপুরুষের স্মৃতি দাগ রেখে গেছে এই মাটিতে। সে মাটি ছেড়ে চলে যেতে কষ্ট হয়। বড় বড় বোঁচকাগুলো বংশী গরুর গাড়ীতে চাপিয়ে দেয়। হাল্‌কাগুলো নিজে নেয়, স্ত্রীকে দেয়। বলে—চল্ যশোদা সন্ধে হয়ে এল। আলো থাকতে থাকতে পৌছতে পারলে হয়।

যশোদা মাথা নীচু করে প্রণাম করে ভাঙা ঘরটার উদ্দেশ্যে। তার পর পিছু নেয় বংশীর। মার হাত ধরে জগন্নাথও আস্তে আস্তে এগোয়। শোনা যায় বংশী শব্দ করে কাঁদছে, চোখ মুছছে ঘন ঘন।

হঠাৎ দরদভরা গলায় জিজ্ঞেস করে বংশী—কবে এই অন্যায় শেষ হবে বলতে পারো জগাদা? কবে বুক ফুলিয়ে বলতে পারবো, এ আমার ঘর বাড়ী, আমার দেশ—তুমি কে আমাকে চোখ রাঙাবার?

যে দিন তুমি আমি রুখে দাঁড়াবো চোখ রাঙিয়ে—সেই দিন। নইলে এই যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ আর মড়ক এমনি করেই ভেঙে দিয়ে যাবে আমাদের ঘর সংসার। জগন্নাথ বলে।

দূরে চিক চিক করে খালের নিস্তরঙ্গ জল। খড় বোঝাই নৌকাগুলো দাঁড়িয়ে থাকে স্থির হয়ে। ম্লান আলোয় ধূসর দেখায় শুকনো খড়ের গাদাগুলো। নৌকোর ওপর বসে বসে কারা যেন তামাক খায়, গল্প

করে। লাবনের বড় বাড়ীটার চিমনি দিয়ে ধোঁয়া ওঠে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে।

যশোদা কোলের ঘুমন্ত ছেলেটাকে আদর করে। চুমু খায় বার বার। জগন্নাথের মা যন্ত্রের মতন তুলসীর মালায় ঘোরায়। কি যেন অস্ফুট ফিস ফিস করে। হয়ত অভিশাপই দেয়।

পথ ও প্রান্ত

রোজকার মতন আড্ডা দিয়ে উমাপদ অনেক রাত করে বাড়ী ফেরে। চারদিকে পাথরের মতন নিস্তব্ধতা। সারা বস্তির লোক ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবল মাঝে মাঝে মানুষের গলা শুনতে পাওয়া যায়—বিড় বিড় করে কে যেন বকছে। উমাপদ দরজায় ঘা দিতেই দরজা খুলে যায়। সীতা জড়োসড়ো হয়ে সরে দাঁড়ায় এক পাশে।

উমাপদ জিজ্ঞেস করে—মুখ অমন হাঁড়ির মতন করে আছিস কেন? কত উপায় করলি আজ?

একটা পয়সাও না। সীতা ফিস্ ফিস্ করে বলে।

তার মানে! রাস্তায় বেরোস্ নি বুঝি আজ? রাগে বিকৃত হয়ে ওঠে উমাপদর মুখ।

কে বললে বেরোই নি? সেই সন্ধে থেকে এই অবধি ঠায় রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলাম।

ওঃ, মানুষগুলো সব সাধু বনে গেছে, না? চালাকি মারবার জায়গা পাস্‌নি! কোথায়-রেখেছিস পয়সা? বের করে দে ঝট করে।

মাইরি, তোর গায়ে হাত দিয়ে বলছি একটা মানুষও আসে নি আজ। সীতা ভয়ে কাঠ হয়ে যায়।

ঈস্, ন্যাকামি আর কি? সবার মানুষ জুটছে আর তোর বেলায় যত ধর্মঘট। দাঁড়া, তোর বজ্জাতি ভাঙচি। উমাপদ সীতার শরীর খানাতল্লাস করে দেখে, কোথাও যদি লুকিয়ে রেখে থাকে। তার পর কাঠের বাক্স, কুলংগী—কোনোটা বাদ দেয় না।

তার পর হতাশ হয়ে রাগে ফেটে পড়ে উমাপদ। বলে—আচ্ছা রোজ রোজ এ কী বজ্জাতি আরম্ভ করেছিস বল তো? কাল থেকে উপোষ দিতে হবে খেয়াল আছে তা? যুদ্ধের বাজার দু হাতে টাকা খরচ করছে বাবুরা আর তোর বেলাই যত মানুষ জোটে না?

বিশ্বেস হচ্ছে না? মুখিয়ে ওঠে সীতা। ঘরের বউকে পথে নামিয়েছিস, তার আবার অত হেনেস্তা!

চুপ কর্ হারামজাদী। পাড়া মাথায় করিস নে চিৎকার করে। উমাপদ আধ-ভেজা গামছা দিয়ে মুখ মোছে।—ঐ তো ছিরি! বাঁশের কঞ্চির মত শরীর। কী দেখে পয়সা দেবে মানুষে? রাস্তায় দাঁড়ালেই হয় না, লোক টানবার ক্ষ্যামতা থাকা চাই।

সীতা রাগে দুঃখে শিখায়িত হয়ে ওঠে—সে ক্ষ্যামতাও ছিল একদিন। তোর এখানে এসে সব গেছে। সীতা ছোট মেয়ের মত কেঁদে ফেলে।

উমাপদ জবাব দেয় না। প্রসঙ্গটা এখানেই থেমে যায়। পুরোনো ছেঁড়া কাঁথা বিছিয়ে উমাপদ শোবার আয়োজন করে। সীতাকে খেতে দিতে বলতে তার সাহস হয় না।

এরকম ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটে। স্বামী-স্ত্রীতে কথা কাটাকাটি হয়।

উমাপদ গায়ে হাত তুলতেও কসুর করে না। বস্তির লোকেরা সালিসি করতে আসে। উপদেশ দেয়। সীতাকে সরিয়ে নিয়ে যায় সামনে থেকে। ঝগড়া থেমে যায়। দুজনে ভুলে যায় পুরোনো কথা।

সীতা ঝিবৃত্তি করে দিনের বেলায়, রাতে দাঁড়ায় এসে পথে।

আর উমাপদ রাস্তায় রাস্তায় চা ফিরি করে বেড়ায়। এক হাতে কয়লার উনুন—তার ওপর জল গরমের কেটলিরূপী টিনের ছোট ড্রাম একটা। অন্য হাতে মাটির ভাঁড় আর চায়ের দু একটা সরঞ্জাম। দু পয়সা ভাঁড় চা। ড্রাম থেকে কল খুলে গরম জল বের করে সে চা তৈরী করে দেয়। কেউ কেউ ফাউএর জন্যে ভাঁড় এগিয়ে দেয় উমাপদর সামনে। সে মুখ ভেঙচে উত্তর দেয়—মাঙ্না ! চা, চিনি, কয়লা—আজকাল মাঙ্না দিচ্ছে, না ? শানের ওপর ভাঁড়গুলো আছড়ে ভেঙে দিয়ে লোকেরা পয়সা দিয়ে চলে যায়।

আগে মন্দ আয় হত না চা বিক্রী করে। আজকাল বিশেষ কিছু থাকে না। চিনি কয়লা এ সব চোরাবাজার থেকে কিনতে হয়। কয়লা না পেলে উমাপদ বাড়ীতে বসে থাকে। চিনির সের বাজারে বারো আনা। সীতা মাঝে মাঝে লাইনে দাঁড়িয়ে চিনি নিয়ে আসে। তাতে আর ক ভাঁড় চা হয়।

উমাপদ সকালে বেরোয়। চা বিক্রী করে এগারটা নাগাদ বাজার করে বাসায় ফেরে। আবার তিনটে বাজতে না বাজতে বেরিয়ে পড়ে।

তবু এতদিন উমাপদ কোনো রকমে চালিয়ে এসেছিল। কিন্তু দু মাস থেকে সে আশা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সংঘর্ষে ব্যয় স্ফীত হয়ে চলেছে। কোনোদিন একবেলা খাবার জোটে, কোনোদিন ছোলা চিবিয়ে পড়ে থাকতে হয়। তাই উমাপদ বউকে পথে নামায়।

যাতে দু পয়সা আয় হয় তাই করতে হবে—সংকোচ করলে চলবে কেন ? বস্তির অন্য মেয়েরাও এ পথে নেমেছে। সীতা রাতের শেষে দু পয়সা উপায় করে, তাইতে হাতের সঙ্গে মুখের প্রাচীন সম্পর্কটা বজায় থাকে। গণিকাবৃত্তি ? কে না গণিকাবৃত্তি করছে ? পেটের জ্বালায় কত শত লোক অভুক্ত হয়ে দিন কাটাচ্ছে—তার আবার নীতিজ্ঞান ? উমাপদ নিজের মনের সঙ্গে বিচিত্র প্রশ্নোত্তর করে। আজকাল বউ-এর সঙ্গে তার সম্বন্ধটা অর্থের, মনের নয়, কোনো দৈহিক সম্পর্কের নয়। উমাপদ দূরে দূরে থাকে। চা বিক্রী শেষ হলে কারো বাড়ী গিয়ে আড্ডা মারে কিংবা পার্কে বসে গল্প করে। রাত হলে বাড়ী ফেরে। সীতা দাঁড়িয়ে থাকে তখনো। মুখে একরাশ খড়িমাটির গুঁড়ো। চোখে কাজল। ঠোঁটে পানের রস। ভদ্রগোছের লোক দেখে প্রেতায়িত হাসি ! সীতা পুতুলের মতন গতানুগতিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। উপায় কী না দিয়ে ? টাকা পেলে তবে উনুন ধরবে কাল সকালে। ধার হয়ে গেছে বিস্তর। বাড়ী ভাড়া বাকী পড়েছে।

কোনো কোনোদিন সীতা মন খারাপ করে বাড়ীতে বসে থাকে। পুরোনো খদ্দেররা ঠিকানা জানে। হয়ত তাদের মধ্যে থেকে—দু-একজন আসতেও পারে। মনে মনে ভাবে সীতা। কিন্তু সীতার দুর্ভাগ্য—কেউ আসে না। তাকেই পথে বেরুতে হয়। জীবনের বৃহত্তম অসম্মানের জগদ্দল পাথর মাথায় নিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে ফুটপাথের ওপর। লজ্জায় তার মুখ লুকোতে ইচ্ছে করে। কে না কে দেখে ফেলবে তাকে। রাস্তার লোকেরা যেতে যেতে বিদ্রূপ করে যায়। বস্তির ছেলেরা গলা খাঁকারি দেয়। চালের দোকানের সামনে মেয়েদের সীমাহীন মিছিল। সেই কখন চাল দেবে কাল সকালে। তার জন্যে এখন থেকে এত তদ্বির। অপরিমেয় ক্লান্তিতে পা দুটো টনটন্ করে।

কান্না পায় সীতার। তবু বাঁচতে হবে। মান, সম্ভ্রম, সতীত্ব, হয়ত মনুষ্যত্বও পুড়ে খাক হয়ে গেছে পেটের জ্বালায়। বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষের বেঁচে থাকবার আকাংখা—জীবনকে বিকৃত করে, কলংকিত করে, অসম্মান করে।

সেদিন এক বাবুকে ধরে নিয়ে আসে সীতা। কোনো এক লোহার কারখানায় কাজ করে সে। মাইনের চেয়ে তার উপরি বেশী। চেহারায় চেকনাই আছে। চোখের ভুরু দুটো সাদা। ছোট ছোট চুল দশ আনা ছয় আনা ভাগে টেরি কাটা। সীতা তাকে যত্ন করে বসায়। যাবার সময়ে সীতাকে তার প্রাপ্যের চেয়ে আট আনা পয়সা বেশী দিয়ে যায় লোকটা। বলে—এই হাড়সার চেহারা! কদিন ব্যবসা চালাবে এমনি করে? আট আনা বেশী দিলাম। ভালো করে দুধ ঘি খেও, বুঝেছো?

সীতা দমবন্ধ-হয়ে-আসা ফুসফুসে ভালো করে নিশ্বাস নেয়। শরীরের সমস্ত জীবনীশক্তি কে যেন শুষে নিয়েছে এক মুহূর্তে। তাঁর পা দুটো কেঁপে ওঠে ঠক্‌ঠক্ করে তবু ফিকে হাসি হেসে সে বাবুকে আবার আসবার জন্যে অনুরোধ জানায়।

লোকটি চলে গেলে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে সীতা। তার খড়িমাটি মাখা গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। কেন? কেন সে নিজেকে এই ভাবে ক্ষয় করবে তিলে তিলে? মানুষের তৈরী দুর্ভিক্ষকে ডেকে আনবে তুমি—আর আমি নিজের মান সম্ভ্রম জীবন উৎসর্গ করে উপচার জোগাবো তার? তুমি মুনাফার লোভে শস্য মজুত করে রাখবে—আর আমি ফুটপাথের গণিকা হবো তার জন্যে? কেন? কেন হাজার হাজার দরিদ্র মানুষ রাতের পর রাত দু মুঠো চাল নেবার আশায় তোমার দোরে এসে হানা দেবে? ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সীতা। ফুলে ফুলে ওঠে।

উমাপদকে আজকাল ধার দেয় না কেউ। আগেকার ধারই শুধতে পারে

নি—তার ওপর আবার নতুন ধার ! চা, চিনি আর দুধ কেনার পয়সা সে সাবধানে তুলে রাখে। এ পয়সা খরচ হয়ে গেলে তার ব্যবসা বন্ধ। কী দেমাক এই চোরাবাজারের ! উমাপদ শ্লেষোক্তি করে। আমাদের দিনও আসছে। মানুষের বড় হয়ে বাঁচবার দিন। সমান হয়ে বাঁচবার দিন। সেদিন দেখে নেব তোমাদের সকলকে। কথাগুলো উমাপদর মনে নিরুচ্চারিতই থেকে যায়। তাঁর দাদা রমাপদকে মনে পড়ে। মনে আলোড়ন তোলে তার কথাগুলো। বজবজের কোনো এক পাট কলে কাজ করে সে। সে নাকি চটকল ইউনিয়নের একজন কর্মী। সম্প্রতি সর্দারের মুখের ওপর কথা বলায় চাকরী গেছে তার। উমাপদ খালি পেটে চিন্তা করে। এই অমানুষিক দারিদ্র, মদমত্ত শক্তিমানের এই পাশবিক জুলুম। রমাপদর বলা স্বর্গরাজ্য সত্যিই কি একদিন আসবে ? হয়ত তার আগে তাদের মতন কত মানুষকে রক্ত দিয়ে যেতে হবে রথের চাকার নীচে।

খিদেতে উমাপদর পেটের ভেতরটা মোচড় দেয়। কিন্তু তবুও সীতাকে খেতে দিতে বলতে তার সাহস হয় না। জানে—রান্না হলে নিশ্চয়ই খাবার দিত। উমাপদর রাগ জল হয়ে যায়। শুয়ে শুয়ে সে নিরুপায় হয়ে একটা বিড়ি ধরায়। সীতা ন্যাতার মতন পড়ে থাকে কাঁথার এক পাশে। উমাপদর দয়া হয় তার ওপর। একটা সবল জীবনের স্বপ্ন চোখে ভাসে তার।

সীতা এক সময়ে উঠে থালা থেকে রুটি বের করে উমাপদর হাতে দেয়। বলে—এই নাও। সকালের দুটো রুটি পড়েছিল। এ বেলা রান্না হয় নি। এক টুকরোও কয়লা ছিল না উনুনে। কাল সকালে কি হবে, কি জানি। উমাপদ উঠে বসে এক লাফে। বলে—কই ? তুই নিলিনে ?

এই যে আমার আছে একটা। সীতা হাসে। পুরোনো ঝড়ের লেশমাত্র চিহ্নও তার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না আর।

খেতে খেতে উমাপদ বলে—এই করতে করতে আমরাও একদিন রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াবো, বুঝলি সীতা ?

তার আর বাকী থাকলো কী ? আমরা কি আর মানুষ আছি ? এমনি করে তো রাস্তার কুকুর পর্যন্ত পেট ভরাচ্ছে।

ঠিক বলেছিস। এমনি করে তো কুকুর-বেড়ালও পেট ভরায়। জলের ঘটিটা তুলে নেয় উমাপদ।—কিন্তু আমাদের দিনও আসছে, বুঝলি ! আমাদের বাঁচার দিনও আসছে। সে দিন বলছিল রমাপদ।

তার পর দূরে মজুমদার-বাড়ীর ঘড়িতে দুটো বাজে। উমাপদর পাশে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে পড়ে সীতা। অন্য দিনের মতো সরে যায় না উমাপদ ঘৃণাভরে, সীতার স্পর্শ থেকে দূরে। এই বিশীর্ণ সীতাকে ঘিরে জীবন-যুদ্ধের এক সমতল ক্ষেত্রে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দোল দেয় আর একটা জীবন। মনে পড়ে রমাপদর কথাগুলো।

উমাপদ বহুদিন পরে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় সীতার। কি জানি কেন, সীতার কান্না পায়। ফুলে ফুলে কাঁদে সে।

তার পর দরজায় তিনটে ঘা পড়ে হঠাৎ ! ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ে সীতা।

উমাপদ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে—কে এল আবার এত রাতে ?

তেওয়ারী এসেছে। একটু রাত করেই আসার কথা ছিল।

সবল কণ্ঠে চিৎকার করে উঠতে চায় উমাপদ—না।···তার পর অসহায়-ভাবে ছেঁড়া ময়লা বালিশটা নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে যায় বাইরে। আকাশে এক ফালি ফ্যাকাসে চাঁদ। সে একটা বিড়ি ধরায়। বস্তির বিশু লোহার কোনো এক হিন্দি ফিল্মের অনুকরণে গান গায়। কান খাড়া করে শোনে উমাপদ।

কয়েক দিন ধরে গ্রামে কান পাতবার জো নেই। সবার মুখে একই কথার আলোচনা। হাটে, মাঠে, ডাকঘরে লোকে প্রসঙ্গটা নিয়ে মনের আনন্দে নাড়া-চাড়া করে। বুড়ো অন্নদা লাঠি হাতে সারা গাঁ চষে বেড়ায়। বাড়ী বাড়ী খবরটা পৌছে দেয়া যেন তার বেকার জীবনের একটা মস্ত কাজ !

ভবানীর বউ-এর কানে পর্যন্ত অন্নদা খবরটা তোলে—হেঁ হেঁ, এবার আর অন্নসমস্যা বলে কিছু থাকল না গাঁয়ে। নরহরি নিজে লঙ্গরখানা খুলছে। সবাইকে নাকি বিনে পয়সায় খিচুড়ী বিলি করবে। শুনছো ভবানীর বউ ; খবরটা শুনে রাখো। আগে ভাগে নাম লিখিয়ে আসতে পারলে এ যাত্রা বেঁচে গেলে কিন্তু। বিস্তর টাকা খরচ করছে কর্মকার। দু দিন পেট ভরে খেতে পেলে তোমার ছেলেমেয়েগুলোর হাড়ে মাংস লাগবে, বুঝেছো।

মাথায় এক হাত ঘোমটা টেনে সামনে বেরিয়ে আসে বছর সাতাশ আটাশের একটি স্ত্রীলোক। বলে—এই কথাই তো শুনছি সব্বার কাছে। কানাই কাল গঞ্জে গেছলো। সেও নিজের চোখে দেখে এসেছে। সে নাকি বিরাট আয়োজন। সারা গেরাম শুদ্ধু ছেলেমেয়ে দু বেলা পেট ভঁরে খেতে পাবে।

অন্নদা দাড়িতে হাত বুলোয়, মাথা নাড়ে আর হেঁ হেঁ করে হাসে।

ভবানীর বউ কাপড়ে চোখ মুছতে মুছতে বলে—সেই কবে চাকরীর খোঁজে শহরে গেছে কানাইয়ের বাপ। এখনও চিঠি দেবার ফুরসুৎ হল না। এদিকে ভেবে ভেবে পাগল হয়ে গেলাম আমি।

সবুর করো। আরো দু দিন সবুর করো। ভবানী আপনিই চিঠি দেবে। দিন রাত হয়ত কাজের তল্লাসে ঘুরছে বেচারী। সময় পায় না দু লাইন লেখবার। সান্ত্বনা দেয় অন্নদা।—না হয়, চিঠি লিখে দাও গোবর্ধনের ঠেঙে। চলে আসুক ভবানী। নরহরির লঙ্গরখানায় একটা কিছু ব্যবস্থা হয়েই যাবে। তার পর নতুন ধান উঠছে দু এক মাসে। কী বল ভবানীর বউ, তখন আর না খেয়ে মরতে হবে না এমনি ভাবে।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ভবানীর বউ। দাড়িতে পাক দিতে দিতে অন্নদাই বলে—বড় পরোপকারী লোক ঐ নরহরি। লঙ্গরখানা তো ও নিজের গ্রামেও খুলতে পারতো। তা না, আমাদের গাঁয়ে খুলল। আমাদের গাঁয়ের লোকের প্রতি অত দরদ কিসের? গেরাম কি আর ছিল না এ অঞ্চলে? তাই বলি পরোপকারী মন না হলে এ হয় না। যাই, গৌরীকে খবরটা দিয়ে আসি একবার। শুনে মনটা হাল্কা হবে। কাপড়ের অভাবে রাস্তায় বেরোতে পারে না বেচারী। পুরোনো মশারীর জাল দিয়ে কোনো মতে লজ্জা ঢেকে আছে।

অন্নদা লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বাঁশ বনে ঢুকে পড়ে। ভবানীর বউ একবার ঘোমটা খুলে আকাশের দিকে তাকায়। তার পর হাত জোড় করে কি যেন বিড় বিড় করে। তার শীর্ণ মুখে ফুটে ওঠে যৌবনের ফ্যাকাসে রং।

গঞ্জের ধার ঘেঁষে লঙ্গরখানার বিরাট চালা বাঁধা হয়। নরহরি কর্মকার নিজের গ্রাম থেকে নৌকো করে প্রতিদিন একবার তদারক করতে আসে। বাজারের লোকেদের সঙ্গে এই নিয়ে আলাপ আলোচনা করে।

ঘাটে নৌকো ভিড়বার আগেই হৈ চৈ পড়ে যায় বাজারে। মতি ময়রা গিয়ে সবার আগে অভ্যর্থনা জানায়। বিশু মণ্ডল মাথা হেঁট করে নমস্কার করে। তার রোদে সেঁকা গাল দুটো টোল খেয়ে ওঠে আহ্লাদে। মনাই মাঝি যাবার সময়ে দু সের ওজনের একটা রুই মাছ নৌকোয় তুলে দেয় কোনো কোনো দিন। নরহরি শিল্পীসুলভ ভঙ্গীতে হাসে। চোয়ালের মাংস স্ফীত হয়ে ওঠে একবার। তার পর চুপসে যায়। খোলা হাওয়ায় নৌকো নদীর মাঝখানে গিয়ে পড়ে। আকাশমুখী পাল বেলুনের মতন ফুলে ওঠে স্বকীয়তায়। নরহরি কর্মকার ধারালো চোখ দুটো ঘাটের দিকে বিস্ফারিত করে দেয়। মতি ময়রার খাবারের দোকানের পাশে তার লঙ্গরখানার চালাটা তৈরী হয়ে এল বলে। কয়েক দিন পরে গ্রামের বুভুক্ষু লোকেরা দলে দলে তার অন্নসত্রে এসে ভীড় করবে, অন্ন ভিক্ষে করবে তার কাছে। নরহরি স্টিমারের বাঁশি শুনে চোখ ফিরিয়ে নেয়। দূরের ঘাটে বরিশাল-যাত্রী স্টিমার এসে ভিড়েছে।

বিশু মণ্ডল পান চিবুতে চিবুতে নরহরির সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা

করে—আপনার দানের খবর আর কারো জানা থাকতে বাকী নেই। সারা গাঁ শুদ্ধু লোক ভ্যান ভ্যান করছে এই নিয়ে। মহানুভব লোক আপনি। তা না হলে এমন ধারা করুক দেখি কেউ। গাঁ কে গাঁ উজাড় হয়ে গেল বলে। কুকুর বেড়ালের মতন দিনে রাতে মানুষগুলো মারা গেল না খেয়ে। কই এগিয়ে এলো কেউ? তা এসব হল গিয়ে মহানুভব মানুষের কাজ। আপনি কি বলেন?

খুক্ খুক্ করে হাসে কর্মকার। বলে—এ সব কথা আর ক জন লোকে বোঝে বল। আমার যা সাধ্যি করে যাচ্ছি। আর কতটুকুই বা দিয়েছেন ভগবান। এই তো আমার নিজের গেরামে—যা পেরেছি, তা দু হাতে দিয়েছি। কিন্তু স্বীকার করুক দেখি মানুষগুলো। সর্বদা যেন তেরিয়া হয়েই আছে। তা অতদূর যাবে কেন, তোমাদের গেরামের বেলাও তো কিছু কসুর করি নি। চাষীরা ধান চাল বেচতে এলে চড়া দামে কিনেছি। নরহরি কর্মকার ঠকিয়ে নিয়েছে এ কথা তো আর কেউ বলতে পারবে না। তুমিই বল মণ্ডল, ঠিক কথা বলছি কি না। আত্মসন্তুষ্টিতে নরহরির গালের চামড়া কুঁচকে যায়।

ছি, ছি, শত্তুরেও ও কথা বলবে না। বলুক দেখি, বাপের জন্মে ধানচাল কেউ খরিদ করেছে অত দামে? বিশু রাগে গরম হয়ে ওঠে। মাটিতে পিক ফেলে কয়েকবার। ঠোঁটের বাইরে বেরিয়ে আসে তার বিবর্ণ দাঁতগুলো।

এবার সিদ্ধেশ্বর চক্কোত্তি কিন্তু বেজায় জব্দ হয়েছে। কি বল মতি? টাকায় পাঁচ পোয়া চাল। কটা লোক কিনে খেতে পারে একবার বিচার করে দেখ। লঙ্গরখানা খুলছে দেখে মুখটা যেন আষাঢ়ে মেঘের মতন করে আছে। কর্মকারের নামে কি কম অপবাদ রটাচ্ছে বলতে চাও? গাঁয়ের লোককে লুটে এই অল্প দিনে কয়েক হাজার টাকা

বানিয়ে ফেলেছে। গাঁয়ের অর্ধেক আবাদী জমি পর্যন্ত চক্কোত্তির হাতের নীচে—মায় কুবালা পর্যন্ত। বিশু মণ্ডল অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে। তাই নাকি? নরহরির জিজ্ঞাসু চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।—তা হলে কি কারবার গুটিয়ে বসেছে সিদ্ধেশ্বর! এটা কিন্তু ভালো নয় বুঝলে মণ্ডল। হাজার হোক কারবারী মানুষ। ব্যবসা করে স্ত্রী-পুত্রের সংসার চালাচ্ছে। দু পয়সা না হয় রোজগারই করেছে এই বাজারে। তাই বলে···। কর্মকারের দ্বিধাগ্রস্ত মন পুরোপুরি প্রকাশ পায় না।
রোজগার নয়। রোজগার করলে তো বুঝতাম ধর্ম বলে কোনো পদার্থ আছে। টাকায় পাঁচ পোয়া চাল! কিন্তুক দেখি কার ঘাড়ে ক-টা মাথা আছে? অথচ চাষীদের মাঠের ধান—ক টাকা দিয়ে কিনেছে সিদ্ধেশ্বর? তুমিই বল মতি, তোমার তো নিজের জোত-জমি আছে, নিজের চোখেই দেখছো সব। অসময়ে ধান চাল নিতে গেলে কবালা পর্যন্ত নিজের নামে করিয়ে নিয়েছে। অথচ রাতের বেলা চক্কোত্তির নায়ে যে কত ধান চাল গ্রাম ছেড়ে শহরে যাচ্ছে তার ঠিকানা আছে? থানার পঞ্চানন সিকদার গুণে নিচ্ছে করকরে টাকা। কার দায় পড়েছে নাও আটকাতে? অথচ শুনতে পাই সরকার নাকি এর বিপক্ষে আইন জারী করেছে। বিশুর কপালের সমস্ত শিরা উপশিরা উত্তেজনায় ফুলে উঠে।
নরহরি ডানা ঝাড়া দিয়ে ওঠে—তুমি নেহাৎ মিথ্যা কথা বলো নি মণ্ডল। ব্যবসায় নামলে প্রবৃত্তি কখন কোন্ দিক দিয়ে ছোট হয়ে যায় তার ঠিক নেই। তবে কি জানো, ব্যবসা তো আর মন্দিরের পুরুতগিরি না। তাই সবখানে সাধুগিরি চলে না। নিজেকেও তো খেয়ে পরে বাঁচতে হবে, কী বল সন্তোষ?
পরামাণিক মাথা নাড়ে। বলে—একশোবার। নিজেই যদি খেয়ে পরে বাঁচলাম না তা হলে আর জাতি ধর্মের অস্তিত্ব থাকলো কোথায়?

এই ধরো না আমার পেছনে আমাকে কত লোক গাল দেয়—আমি নাকি মজুতদার! নরহরি সকলের সামনে এক পশলা হেসে নেয়।—অথচ দুর্ভিক্ষের সময়ে আমিই তো যথাসাধ্য দিচ্ছি। এই যে লঙ্গরখানা, এখানে কি বিনে পয়সায় যজ্ঞি চড়বে বলতে চাও? যাই করো হাতে পয়সা চাই। মজুতদারী আর যাই বলো মণ্ডল, টাকা ছাড়া জীবনে কিছু নেই।

বিশু মুহূর্তে চিন্তিত হয়ে ওঠে। মতি ময়রার মুখেও নতুন উদ্বেগের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়। সন্তোষ পরামাণিক বোকার মতন নিজের ব্যক্তিত্বকে গুরুত্ব দেয়ার চেষ্টা করে। কোথায় যেন জট পাকানো সুতোয় নতুন জট পাকিয়ে যায়।

চালার ওপর থেকে কে যেন নরহরিকে লক্ষ্য করে বলে—আমাদের কাজ আজকে শেষ হল, কী বলেন কর্তা? কাজের তো আর কিছু বাকী নেই।

হাঁ, আজ থেকে তোদের ছুটি। যাবার আগে পঞ্চুর কাছ থেকে মজুরী নিয়ে যাস, বুঝলি। নরহরির গলার স্বর কাঁসার মতন কর্কশ শোনায়।

মতির ছোট ছেলেটা ভাঁড়ে করে চা দিয়ে যায় নরহরির জন্যে। নরহরি চুমুক দিতে দিতে বলে—হেঁ হেঁ, বেড়ে চা বানাতে জানে তো হে তোমার ছেলেটা, মতি। দোষের মধ্যে দুধটা একটু কম দিয়েছে, এই যা। নইলে খাসা হয়েছে।

যা দুধ নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি। হতভাগার সমস্ত কাজই এই রকম। রাগে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে মতি ময়রা। ছেলেটা বাপের দিকে তাকিয়ে দোকানের উদ্দেশ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

হাত কচলাতে কচলাতে মতি ময়রা এগিয়ে যায় নরহরির দিকে।

দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলে—একটা কথা কিছু দিন থেকে বলবো বলবো মনে করছি কিন্তু সাহসে কুলোয় নি। এদিকে কিন্তু দোকানপাট তুলে দেবার জোগাড় হয়েছে। কিছু চিনি যদি কিনিয়ে দিতে পারেন তাহলে এ অধমের অনেক উপকার হয়।

চিনি? চিনি কি আর বাজারে আছে কিছু? কর্মকার খুক খুক করে হাসে। গুড়, গুড় ব্যবহার করো হে, বুঝলে। যেমনি অবস্থা তেমনি ব্যবস্থা। কী আর করবে? একটা অন্যায় আবদার করলেই তো আর হল না।

কারবার বলতে গেলে তো এক রকম গুড় দিয়েই চলছে। কিন্তু তাই কি চলে সারা বছর? পুজো পার্বণ এ সবও তো আছে। সিদ্ধেশ্বর হাত উল্‌টেই বসে আছে। বলে এখানে কেন, কর্মকারের কাছে গেলেই পারো—ওর গুদামে তো মণ মণ চিনি মজুত আছে।

আমার গুদামে মণ মণ চিনি? মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে যায় কর্মকারের মুখ!—কথাটা নেহাৎ মিছে বলে নি সিদ্ধেশ্বর। ভেবেছিলাম কিনে রাখবো কিছু চিনি। তা আর পেলাম কই। শুনতে পাই সরকার নাকি সমস্ত মাল কিনে নিচ্ছে। তা দরকার যখন বলছো তখন নিও, সের কয়েক পড়ে আছে গুদামে—দিয়ে দেবখন কেনা দরে। সের প্রতি এক টাকা করেই দিয়ো। তোমার সঙ্গে তো আর ব্যবসার সম্বন্ধ না। কি বল বিশু মোড়ল—হক কথা বলছি কি না?

বিশু মণ্ডলকে জবাব দিতে হয় না। মতিই কথা বলে—এক টাকা! এত দাম দিলে তো সিদ্ধেশ্বরই দেবে।

বিশ্বেস হল না তো? বেশ আড়তে গিয়ে নিজের চোখেই খাতাপত্তর দেখে এস একবার। আজকাল বাজারই এমনি। ফেলো কড়ি মাখো তেল। ন্যায় অন্যায় কী আর আছে কিছু ধর্মে। নরহরি মতির

ছেলের হাত থেকে দুধের বাটিটা ছিনিয়ে নিয়ে চায়ের ভাঁড়ে উল্‌টো করে দেয়। মতি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে চায়ের রঙের দিকে। রুচি আছে বটে কর্মকারের!

ফেরার সময়ে মতির ছেলেটাকে ঘাটে ঘুরে বেড়াতে দেখে কর্মকার তাকে কাছে ডেকে বলে—কাল তোর বাপকে আড়তে পাঠিয়ে দিস বুঝলি—চিনি নিয়ে যাবে। বলিস, আমি থাকতে তোদের দোকান বন্ধ হবে না। জিনিসপত্র সবই দেব। দাম না হয় দু পয়সা কমই দিবি। নরহরি নিজের মনের প্রসারের কথা ভেবে ফুস্ ফুস্ ভরে নিশ্বাস নেয়। ছেলেটা বোকার মতন তাকিয়ে থাকে। নৌকো তখন ঘাট ছেড়ে হাত দশেক দূরে সরে গেছে। বিশু মোড়ল মাথা হেঁট করতে করতে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ায়। কোথায় যেন একটা অশরীরী সন্দেহ খচ খচ করে মনের মধ্যে।

ভীড় জমতে দেরী হয় না। অন্নসত্র খোলার সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের গ্রাম থেকে দলে দলে লোক এসে ভীড় করে। আটচালার পাশের ছোট ঘরটায় রান্না হয়। আধ-শুকনো কাঠের ধোঁয়া ঘর ছেড়ে পাক খেয়ে আকাশে ওঠে। লোকগুলো ভাবে, এই বুঝি রান্না শেষ হল। অসহিষ্ণুতায় মাটির ভাঁড়গুলো ঝেড়ে মুছে পরিস্কার করে তৈরী হয়ে নেয় সবাই। সেই কোন্ সকাল থেকে বসে আছে। কত বেলা হল তার ঠিক নেই! ভীড়ের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। অনেকে আবার নদীতে স্নান করে এসে বসেছে। ময়লা তালি দেয়া কাপড় কয়েক পাক জড়িয়ে নিয়েছে ভালো করে। জট পাকানো চুল ছড়িয়ে দিয়েছে পিঠের ওপর। কেউ বা চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে।

খিদের জ্বালায় উলঙ্গ ছেলেগুলো কান্না জুড়ে দেয়। মারামারি লেগে যায় পরস্পরে। বয়স্করা থামায়। মেয়েরা হাত চালাতে কসুর করে না। পটলের মাটির থালাটা ষষ্ঠিচরণ নাকি ভেঙে দিয়েছে বাড়ী মেরে। কেন? কেন তোর ছেলে আমার নাতির থাল ভাঙল্রে? চিৎকারে গলাটা কর্কশ করে ফেলে পটলের ঠাকুরদা।

ঈস, আমার ছেলের খেয়ে দেয়ে কাজ নেই তোর নাতির থাল ভাঙতে গেল? রাগে মুখ বেঁকিয়ে উত্তর দেয় শৈলবালা।

আহ্লাদ! মিছে কথা বলছি আমি? পটল চোখ মুছতে মুছতে দুটো কিল বসিয়ে দেয় ষষ্ঠিচরণের মুখে।

তার পর ঝগড়াটা আরও গড়ায়। পটলের ঠাকুরদা শৈলর চুলের ঝুঁটি ধরতে যায়। লোকেরা হৈ হৈ করে ছুটে এসে হাত ধরে সরিয়ে নিয়ে যায় বুড়োকে। নরহরি কর্মকারের চাকর পঞ্চু এসে শাসিয়ে যায়। বলে—তীর্থের কাক যেন! রান্না চড়তে না চড়তে একেবারে ধন্না দিয়ে পড়েছে। মারামারি ঝগড়া করলে আজকের মতন কিন্তু খিচুড়ী দেয়া বন্ধ করে দেব।

অন্নদা ঘোলাটে চোখ দুটো তুলে পঞ্চুকে ভালো করে দেখে নেয়। গায়ে লাল রঙের জামা, মাথার চুলগুলো চকচক করছে তেলে, চোখ দুটো জবা ফুলের মতন লাল। অন্নদা কথা বলতে বলতে থেমে যায়। মন্মথর মা ফিস ফিস করে বলে—চেপে যাও, মেজাজ দেখিয়ে আর কী করছো বল? মাঝ থেকে খাওয়াটা বন্ধ হয়ে যাবে।

অন্নদা উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকে। বুকটাকে চেপে ধরতে চেষ্টা করে লাঠিটায় ভর দিয়ে।

বেলা চারটের পর খিচুড়ী বিলি আরম্ভ হয়। পঞ্চু নিজেই দু হাতা করে খিচুড়ী ঢেলে দেয় সকলের পাতে। পাতলা জলের মতন

খিচুড়ী—তামাটে রং। সবাই সামনের গাছতলায় গিয়ে বসে। গাছের এক পাশে মেয়েদের মধ্যে ভবানীর বউকে জড়োসড়ো হয়ে বসে খিচুড়ী খেতে দেখা যায়। তার চোখে জল! অন্নদা চোখ নামিয়ে মাথা নীচু করে খিচুড়ীর ওপরকার জলটুকু চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলে।
রোজ সবার ভাগ্যে খিচুড়ী জোটে না। অনেকে খালি পেটে ফিরে যায়। লোকের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ে। কাছাকাছি গাঁ থেকে যত রাজ্যের লোক এসে অন্নসত্রের পাশে পায়চারি করে বেড়ায়। পঞ্চু মনে মনে বলে—দাঁড়া মজা দেখাচ্ছি সবাইকে। বাবুকে বলে বন্ধ করে দেয়াচ্ছি এ রোজকার যজ্ঞি। দায় পড়েছে ভিখিরী খাওয়াতে।

লঙ্গরখানা বন্ধ হয় না। কর্মকারের ইচ্ছে—লঙ্গরখানা চলুক। লোকে জানুক, নরহরিও দান-ধর্ম করতে জানে। ব্যবসাদার হলে কি হবে? তার চোখে মানুষের দুঃখ দারিদ্র এড়িয়ে যায় না।
এদিকে কাজে এলে কর্মকার একবার লঙ্গরখানায় ঘুরে যায়। বুভুক্ষু মানুষদের খেতে দেখলে তার বুক ভরে ওঠে আনন্দে। আহা! কতদিন পেট ভরে খায় নি বেচারীরা! নরহরি কর্মকারের মন ভিজে হয়ে ওঠে দাক্ষিণ্যে।
জগদীশের অনাথা বিধবা মেয়েটাও লঙ্গরখানায় খিচুড়ী নিতে আসে। হাতে এলুমিনামের পুরোনো বাটি। গায়ে আধছেঁড়া থান কাপড়। জামা নেই গায়ে। চূড়ান্ত দারিদ্র ও দৈন্যের মধ্যেও তার জৌলুস চোখে পড়ে। বাপ-মা মারা যাবার পর সে মামার বাড়ীতে ছিল কিছু দিন। সময় বুঝে তারাও খেদিয়ে দিয়েছে। গৌরী এসে দাঁড়িয়েছে লঙ্গরখানায়। পথে দেখা হলে বিশ্বেশ্বর কামার লোভ দেখায়—কতদিন

আর ঘুরে বেড়াবি পথে পথে ? তার চেয়ে যা বলেছিলাম তাই কর। আরামে থাকবি। আমার দু মুঠো ভাত জুটলে তোরও জুটবে। বয়সটা না হয় একটু বেশীই হয়েছে।

গৌরী পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়। বিশ্বেশ্বরের মাথায় সাদা চুলগুলো দেখে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায় তার চোখ মুখ।

গৌরীকে দেখে কর্মকারেরও দয়া হয়। প্রথমে কথা বলতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় কর্মকার। ভিখিরী হলেও গৌরীর বয়স হয়েছে।

পঞ্চুর কাছে শুনলাম তোমার নাকি কষ্ট হচ্ছে এখানে। ঢোঁক গিলে নেয় নরহরি।—তা হবারই কথা; এ সব খাওয়া তোমার সহ্য হবে কেন ?

গৌরী অসহায় ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকে। কর্মকারের হলদে চোখের সঙ্গে এক মুহূর্তের জন্যে তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়।

তাই বলছিলাম তুমি কিছুদিন আমার বাড়ীতে এসে থাকো। খাওয়া থাকার কোনো কষ্ট হবে না। কাজের মধ্যে একটু আধটু সংসারের কাজকর্ম দেখা শোনা করবে। এই আর কী ? মাঝে মাঝে আমার দিকে একটু নজর টজর দিও। বিপত্নীক মানুষ ! নরহরির দৃষ্টি লোলুপ হয়ে ওঠে মুহূর্তে।

সোজা হয়ে দাঁড়ায় গৌরী। স্তন দুটোর ওপর কাপড় টানবার নিষ্ফল চেষ্টা করে। জট পাকানো চুলের ওপর আঙুল চালিয়ে দেয় সযত্নে।

কী বল, রাজী তো ? কর্মকার গলার স্বর পরিবর্তন করে। ভালো না লাগলে চলে এস। কেউ তোমায় ধরে রাখবে না।

গৌরী কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ভাঙা এলুমিনামের বাটিটা ধীরে ধীরে চেপে ধরে বুকের ওপর।

গলা থেকে রেশমের চাদরটা খুলে নিয়ে নরহরি ছুঁড়ে দেয় গৌরীর দিকে। বলে—যেও। ফেরার পথে পঞ্চু সঙ্গে করে নিয়ে যাবে তোমাকে। কর্মকার ঘাটের দিকে এগিয়ে যায়। মাঝিরা সোরগোল তুলেছে। ঈশাণ কোণে মেঘ করেছে। ঝড় উঠতে পারে হয়ত। নদীতে ঢেউগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে উত্তেজনায়।

জবর ফসল ফলেছে এবার রসুলের মাঠে। যতদূর দু চোখ যায়—কেবল ধান আর ধান। ফসল সোনা করে দিয়েছে কল্যাণপুরের মাটিকে। এমন ফসল এ অঞ্চলে বহু বছর হয় নি। ধানের ভারে নুয়ে পড়েছে গাছগুলো। কে যেন সোনার জল লেপে দিয়েছে গাছগুলোর গায়ে। মাঠের মাঝখানে সরু পথগুলো ধান গাছে ঢাকা পড়ে সোনা হয়ে উঠেছে। রসুল চোখ বড় বড় করে সময়ে অসময়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখে। তার অর্ধাহার-ক্লিষ্ট শরীর সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে আশায়। এবার হয়ত সারা গ্রামের মানুষ পেট ভরে খেতে পাবে। দুর্ভিক্ষের হাহাকারে বিষিয়ে-ওঠা মানুষগুলো বেঁচে উঠবে নতুন করে।

রসুল পাশের গ্রাম থেকে আমানতকে ডেকে এনে নিজের ক্ষেতের ধান দেখায় নিজের আনন্দকে ভাগ করে নেবার চেষ্টায়।

তোর সবখানেই সমান, বুঝলি। আমানত দাড়িতে টান দেয়।

আমাদের গ্রামেও কি ফসলের ঘাটতি দেখেছিস? তা এ হল তোর খোদার দান, বুঝলি? দেন যখন তখন আর দেয়ার কিছু বাদ থাকে না।

ওঃ খোদার দান! গতর খাটাই নি যেন? কেন, সারাটা বছর তো মানুষ না খেয়ে খেয়ে মলো—মেয়ে মানুষগুলো বেবুশ্যে হয়ে চলে গেল শহরে। ঝুটো বলছিনি চাচা, নিজের চোখে দিখিছি। কত মেয়ে-মানুষকে গদাইবাবুর নৌকো করে অন্ধকারে চলে যেতে দিখিছি। কই তেনারে তো একটি দিনের তরেও মুখ তুলতে দেখলাম না। ও সব আদিক্ষেতার কথা আর নাই বললে চাচা। রসুলের কপালের শীর্ণ শিরাগুলো উত্তেজনায় ফুলে ওঠে।

কথাগুলো মিছে বলিস নি রসুল। আমিও নিজের চোখে বহু লোককে মরতে দিখিছি। জমিদার বাবুরা এক মুঠো চাল দিয়েও সাহায্য করেন নি। হাজার হাজার বিঘে জমি গ্রামের মহাজন আর বাবুদের হাতে চলে গেছে। যাক এর শাস্তিও খোদা দেবেন। আমানত আকাশে অদৃশ্য শক্তির উদ্দেশ্যে হাত বাড়ায়।

আমানত নিজের মনে মনে প্রতিশোধ নেবার জন্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে। প্রকাণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চায় সে। কিন্তু দিগন্তব্যাপী ধানক্ষেত দেখে আমানত প্রতিশোধ নেবার কথা ভুলে যায়। যাক্ এবারকার ফসলের নীচে গত বছরের সমস্ত দুঃখ দৈন্য গ্লানি চাপা পড়ে যাবে। তাদের হাড়সার শরীরে মাংস লাগবে আবার নতুন করে। আবার পল্লীশ্রী ফিরে আসবে এই গ্রামে। হাটে বসবে মানুষের মেলা।

আমানত জিজ্ঞেস করে—বাপের কোনো খবর পেলি নাকি রসুল?

খবর? খবর কে দেবে? হয়ত শহরে না খেতে পেয়ে মারাই গেছে। বুড়ো মানুষ! পথে জল কাদা ঠাণ্ডা—এসব সহ্য করার কি আর

ক্ষমতা আছে? আর সে কী আজকের কথা—চার মাস হতে চলল। যাক্ ভালোই হয়েছে। হাজার বার বুড়োকে বুঝিয়েছিলাম—শহরে যেও নি। এখানে যা পারি দুটো খুদ কুঁড়ো জোগাড় করে চলে যাবে। তা বুড়ো শুনলো না। জহর, বংশী ওরা সব দলবেঁধে শহরে গেল, বুড়োও গেল সাথে সাথে।

যেন উজোড় হয়ে গেছে কল্যাণপুর গ্রাম। অর্ধেক লোক দুর্ভিক্ষে আর মহামারীতে প্রাণ হারিয়েছে। বাকী লোক গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছে অন্নের খোঁজে। জনহীন খড়ের চালাগুলো ভেঙে পড়েছে বর্ষায়। মানুষের হাহাকারে কালো হয়ে উঠেছে গ্রামের আকাশ। রসুল আর তার বউ গ্রাম ছাড়িতে রাজী হয় নি। তাদের মতন আরও অনেক পরিবার পূর্বপুরুষের ভিটেয় মাথা গুঁজে আছে। পঙ্গপালের মতন শহরের রাস্তায় গিয়ে আশ্রয় নেয়ার চেয়ে নিজের গ্রামে অনাহারে প্রাণ দেয়া অনেক ভালো।

শ্বশুরকে চলে যেতে দেখে কম কাঁদাকাটা করে নি রসুলের বউ। শহরে যাবার জন্যে পায় ধরেছে রসুলের। এই শ্মশানে থাকতে তার ভয় করে। গ্রামের আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে দুর্বৃত্তরা। কখন ফাঁক বুঝে সাকিনাকে তারা চুরি করে নিয়ে যাবে তার ঠিক কী? নৌকা করে মেয়েরা চালান যাচ্ছে শহরে! ভয়ে কাঠ হয়ে যায় সাকিনা! তাকেও যদি এই ভাবে ধরে নিয়ে যায়।

পাগল! রসুল বোঝাবার চেষ্টা করে। ধরে নিয়ে গেলেই হল। ওদের তো পয়সা দিয়ে কিনে নিয়ে যাচ্ছে। এ বাজারে কি ভাবে মাগ ছেলে বিক্রী হচ্ছে তার ঠিকানা আছে কিছু?

তুমি আমাকে বিক্রী করে দেবে না তো গদাইবাবুর কাছে ? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে সাকিনা।

তোকে ? খুক খুক করে হাসে রসুল। যদি বেচেই দেব তাহলে আর তোকে বিয়া করলাম কেনে ?

আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়ায় সাকিনা। পুরোনো আধছেঁড়া কাপড়ে তাকে বড় দরিদ্র অসহায় বলে মনে হয়।

জহর বংশী খয়রুল এরা কম চেষ্টা করে নি রসুলকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে। শহরে ভুরি ভুরি খিচুড়ী বিলি করছে। এখানে উপোসী হয়ে পড়ে থেকে কী হবে ? চল্ দিন কতকের জন্যে না হয় ঘুরেই আসি শহরে। আবার এখানেই ফিরে আসবো।

রসুল টলবার পাত্র নয়। জবাব দিয়েছে—তাহলে আর ধান লাগালাম কেনে ? পড়ে রইলো ঘর বাড়ী, পড়ে রইলো ফসল—এখন ভাতের সন্ধানে বেরোই শহরে। মহাজনের লোকগুলো তো ওৎ পেতে বসেই আছে। মাথা পর্যন্ত দেনায় বিকিয়ে আছে। এখন শেষ সম্বলটুকু খুইয়ে পথে বসলেই হল। মরি তো এই ভিটেতেই মরবো, বুঝলি বংশী। শহরে গিয়ে হাত পাততে পারবো নি।

রসুলের বাপ খয়রুলের কানে কানে বলেছে—ছেলেমানুষ! তাই রক্ত গরম। দু দিন ভাতের মুখ না দেখলে আপনি মাথায় রক্ত উঠবে। আমরা কি আর ভিখিরী যে শহরে ভিখ্ মাগতে যাচ্ছি ? অত লোকের বাস—কাজ একটা না একটা মিলেই যাবে। ও না যায়, ভিটে কামড়ে পড়ে থাক, আপনিই পিছু পিছু আসবে। আমি কিন্তু তোদের দলে রইলাম, বুঝলি খয়রুল। নিজের বিজ্ঞতায় বুড়ো নিজেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে খয়রুল আশ্বস্তই হয়। মুখে অনুজ্জ্বল ভবিষ্যতের কালো ছায়া। দারিদ্রপীড়িত জীবনের আরশীতে আশংকা ঘন হয়ে ওঠে —অন্ন কি মিলবে? অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের সড়কে মৃত্যুপথযাত্রী মিছিল ঊর্ধ্বশ্বাসে অগ্রসর হয়। অন্নদাতা আজ অন্নের খোঁজে নেমেছে পথে! ঘরে ঘরে অর্ধাহার ও অনাহারের সঙ্গে সংগ্রাম করে মানুষ। গঞ্জে মজুতদারের দোকানের খিড়কীর দোর দিয়ে চাল বিক্রী হয়—পঁচিশ ত্রিশ টাকা করে মন। নদী দিয়ে নৌকা বোঝাই চাল চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যায়। ক্বচিৎ ধরা পড়লে ঘুষের দাক্ষিণ্যে আসামী বুক ফুলিয়ে ফাঁদ থেকে বেরিয়ে পড়ে। ঘুষের জোরে বিরাট রাজত্বটা টিঁকে আছে। চাল তো সামান্য কথা।

রসুল মাঝে মাঝে এক পো আধ পো চাল চেয়ে চিন্তে আনে। এক হাঁড়ি জলে আধ মুঠো চাল ফুটিয়ে সুস্বাদু ফেন তৈরী হয়। দুজনে মিলে ভাগ করে খায়। ঢেঁকুর তোলে। সে দিনের মতন খাবার ল্যাঠা চুকলো। আবার পরের দিন দেখা যাবে কি করা যায়। মাঝে মাঝে জংলী সব্জী তুলে আনে। সেদ্ধ করে খায়। পেটের ছেলেটা অখাদ্য খেয়ে মরে যাবে না তো? ভয়ে ভয়ে গলাধঃকরণ করে সাকিনা। শরীরের স্নায়ুগুলো মোচড় দিয়ে ওঠে খিদেতে। শহরে গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখলেও পারতাম—কথাগুলো সাকিনার মনে অনুচ্চারিতই থেকে যায়। রসুল বলে—আমরা তবু তো সুখে আছি সাকিনা। কতলোক দিনের পর দিন না খেয়ে রয়েছে তার ঠিকানা আছে কিছু। আধ-মরা মানুষকে শেয়ালে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঘর থেকে। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে বিক্রী হচ্ছে হাটে বাজারে। বউ ঝিরা বেবুশ্যে হয়ে চলে যাচ্ছে শহরে। সতীত্ব বেচচ্ছে পয়সার জন্যে। আকাল পড়েছে দেশে, বুঝলি। বাঁশ বন দিয়ে আসতে আসতে দেখলাম সেই বজ্জাত গহর পাহারাআলা কোন্ এক

মেয়ের সর্বনাশ করছে। দিনে দুপুরে এমনি অবিচার চলছে। আইন বলে কি আর আছে কিছু? সবই কাগজে কলমে, বুঝলি সাকিনা?

ভয়ে সাকিনা জড়িয়ে ধরে রসুলকে। বলে—চল, এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাই আমরা। মানুষ বাস করে না এ গ্রামে।

পাগল! যাবি কোথায়? যেখানে যাবি সবখানেই এই। মানুষ—আর মানুষ নেই। টাকার লোভে পশু বনে গেছে। নিজের চোখে কত লোককেই তো মরতে দেখলাম। দেখি কতদিন যুঝতে পারি। জেলে বস্তির একটা লোকও বেঁচে নেই। চল্লিশ ঘর মানুষ একে একে শেষ হয়ে গেছে সব। মাঝি বস্তির বহু লোক না খেতে পেয়ে মরে গেছে। যারা বেঁচে আছে তারা কোনো ক্রমে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। নৌকা বাইতে বাইতে আর কাউকে গান গাইতে শুনেছিস? দুর্ভিক্ষে বোবা বনে গেছে তারা সব।

ধুঁকতে ধুঁকতে ফকির রসুলের ঘরে এসে ঢোকে। বলে—রসুল ভাই, দু মুঠো চাল। মাথা নাড়লে চলবে না, যা করে হোক জোগাড় করে দিতেই হবে। মাইরি বলছি, বউটা আর বাঁচবে না—না খেতে পেলে।

বুঝলাম সবই, কিন্তু চাল আনি কোথা থেকে। নিজেই ক দিন ধরে চেয়ে চিন্তে এনে চালাচ্ছি। বাসন কোসন প্রায় সবই বেচেছি। সোনা দানা বলতে যা ছিল তাও তো অনেক দিন গেছে। রসুল নিরুপায় হয়ে পড়ে।

মাইরি বলছি, এক মুঠো দিলেই চলবে। তোকে চার ডবল করে ফিরিয়ে দেব একদিন। পায়ে ধরছি তোর, আর চাইবো না। কেবল আজকের দিনটা দে। হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ে ফকির। তার শরীরে মাংস বলে কোনো পদার্থ আছে বলে বিশ্বাস হয় না।

হাড় দিয়ে তৈরী দুর্ভিক্ষের মানুষ হাসছে, কাঁদছে, চলে ফিরে বেড়াচ্ছে দুর্বল ভঙ্গীতে।

আর দু দিন সবুর কর ফকির, নতুন ধান উঠল বলে। আর কিছু দিন কষ্ট করে নে। তার পর ভালো করে বাঁচবি। কী বলিস, এবার জবর ধান হবে, না?

জবর? হাঁ জবর হবে। ফকিরের শীর্ণ মুখে ক্ষীণ হাসি ফোটে। ঠিক বলেছিস, জবর ধান হবে এবার। কিন্তু আমার কী? ধান শুদ্ধ জমি বিক্রী হয়ে গেছে। গোষ্ঠবাবুই কিনে নেছেন সব। রসুল ভাই, এক মুঠো ধানও আমার নয়—সব গোষ্ঠবাবুর। অথচ— । কাঁপতে কাঁপতে থেমে যায় ফকির। থুথুর সঙ্গে কয়েক ফোঁটা বিবর্ণ রক্ত বেরিয়ে আসে।

রসুল চোখের ইশারায় সাকিনাকে কী যেন বলে। সাকিনা পাশের ঘর থেকে মাটির হাঁড়িতে কয়েক মুঠো চাল নিয়ে আসে। ফকির ধুতির খুঁট এগিয়ে দেয়। কাঁড়া আকাঁড়া চাল ময়লা শতছিন্ন কাপড়ের নীচে দিয়ে গলে পড়ে। চালগুলো তুলে নিয়ে ফকির সযত্নে সেগুলো কাপড়ে বাঁধে, তার পর কোনো কথা না বলে উর্ধ্বশ্বাসে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। ফকিরের চোখে জল! অপমান। লাঞ্ছনা। তার দারিদ্রপীড়িত আত্মা দুর্ভিক্ষের কাছে ছোট হয়ে গেছে, দুমড়ে গেছে বাসি কাগজের মত।

ফকির চলে যেতেই সাকিনা রাগে ফেটে পড়ে—নাও, দয়া করে যে কটা চাল ছিল তাও বিলিয়ে দিলে—এখন কাল খাবে কী?

না দিয়ে উপায় ছিল? তুইই বল। রসুল অসহায় হয়ে উত্তর দেয়।

তুমি আমার পেটের ছেলেটাকে মেরে ফেলবে ঠিক করেছো, না? সাকিনার রাগ আরো বেড়ে যায়। নাও, তাহলে খুন করে ফেলো

আমাকে, ল্যাঠা চুকে যাক্ সব। আমিও যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাই। টাঙিটা এগিয়ে দেয় সাকিনা।

রসুল হাসবার চেষ্টা করে। বলে—দু দিন ধৈর্য ধর বউ। নতুন ফসল উঠ্‌লে সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখে নিস পেটের মধ্যেই খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে উঠবে তোর ছেলেটা।

লজ্জায় সাকিনা ঘরের কোণে গিয়ে মুখ লুকোয়। সুযোগ পেয়ে হো হো করে হেসে ওঠে রসুল। নিজের হাসি শুনে নিজেরই ভয় হয় পরমুহূর্তে।

তবু তো রসুল কোনো ক্রমে এ কটা দিন কাটিয়ে এনেছে। প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের মুখেও নিজেকে ছোট হতে দেয় নি। কাঁড়া আকাঁড়া চাল ডাটা-সেদ্ধ, কলাগাছের গোড়া—কী নয়? অন্নাভাবের মুখে সমস্তই খেয়েছে। তার মতন চাষীদের হাতে একদানা চাল পর্যন্ত নেই। বীজ ধান পর্যন্ত অনাহারের মুখে নিঃশেষ হয়েছে। হাটে ধনী চাষীরা ধান চাল আনে। চড়া দরে বিক্রী করে। ফেরবার পথে মোটা রকম বাজার করে নিয়ে যায়। নিরীহ লোকেরা হিংসে করে। আঙুল দেখায়। ব্যস্ ঐ পর্যন্ত।

ফসলে পাক ধরতে আরম্ভ করছে। সবুজ ধানগাছগুলো হলুদ রঙে সোনা হয়ে উঠছে। ঐশ্বর্যে সম্পৎশালী হয়ে উঠেছে দুর্ভিক্ষের মাটি। প্রকৃতির ক্ষতিপূরণে জেগে উঠেছে মুমূর্ষু চাষীরা। হাওয়ায় পাকা ধানের গন্ধ।

রসুল ভাবে এইবার কেটে গেল দুর্ভিক্ষ। গ্রামে নতুন লোকের আনাগোনা অনুভব করা যায়। ব্যবসাদারের লোকেরা দাদন দিয়ে যায় আগে থেকে। ভাবনা কী? তারা আশ্বাস দিচ্ছে ধান কাটা হলেই তারা নিয়ে যাবে।

রাঘব চক্কোত্তির লোক রসুলের কাঁধে হাত দিয়ে বলে—কোনো ভয় নেই, বুঝলে। টাকাকড়ি দরকার হলে চেয়ে নেবে। তোমরা তো আমাদের আপনার লোক। দেখ যেন আর কাউকে দিও না। এই বলে দিলাম এক কথা—তোমার মাঠের সমস্ত ধানই 'আমি নিলাম। কথার খেলাপ করো না যেন। লোকটি হাসিতে উপচে পড়ে।

রসুলও হাসে। জোর করে কয়েকটা রেখা ফোটাতে চেষ্টা করে মুখে। লোকটাকে সে ভালোভাবে চেনে। ঠোঁটে আর কপালে ধবলের দাগ। নাকটা অস্বাভাবিক রকম ফুলে উঠে একদিকে হেলে পড়েছে। চোখের পাতাগুলো সাদা। কয়েকমাস আগে লোকটাকে রসুল এই গ্রামে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে। চাষীদের ঘর থেকে নাকি ধান চাল কিনতে এসেছিল। শেষ চেষ্টা—যতটুকু সংগ্রহ কর্তে পারে।

রসুল টাকাগুলো নিয়ে ঘরে যায়। এই দুর্ভিক্ষের বাজারে টাকাগুলোর মূল্য নেহাৎ কম নয়। সে ভাবে—হাটে যেতে হবে। টাকার অভাবে বহুদিন হাটে যাওয়া হয় নি। বউয়ের কাপড় নেই। ছেঁড়া কাপড়গুলো জড়িয়ে কোনো মতে লজ্জা এড়িয়ে আছে। রসুলের তার নিজের জন্যেও একটা কাপড় দরকার। তার পর তেল নুন লংকা—এতো আছেই। টাকা দেখে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সাকিনা। তার নিজের চোখকে বিশ্বাস কর্তে সাহস হয় না। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রসুল কোত্থেকে এ টাকাগুলো সংগ্রহ করে আনলো।

লোকের মুখে মুখে খবর রটে যায়। গ্রাম থেকে পাঁচ মাইল দূরে নাকি সরকারী ক্যাম্প পড়েছে? শহর থেকে নিরাশ্রয় চাষীদের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে সরকারী খরচায়। রসুলের বুক ফুলে ওঠে আনন্দে। হয়ত তার বাপও ফিরে এসেছে এদের সঙ্গে।

রোজ একবার করে রসুল বাপের খোঁজে ক্যাম্পে যায়। ভীড়ের মধ্যে মাথা গলিয়ে দেখে—না, তার বাপ আসে নি। যারা এসেছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই মেয়েমানুষ—উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ রোগগ্রস্তা, অনাহার-ক্লিষ্টা। মাথায় তেল পড়ে নি কতকাল—চুলগুলো জট পাকিয়ে গেছে। গায়ে পাঁকের চেয়েও বিশ্রী দুর্গন্ধ। তাদের চোখে মুখে বিভীষিকার ছায়া। তাদের মুখে শহর-যাত্রার কথা শুনে রসুল শিউরে ওঠে রীতিমত। বংশীর বউ ফিরে এসেছে। রসুলকে সে বাপের কোনো খবর দিতে পারে না। বলে শহরে গিয়েই ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। যে যার ভাতের সন্ধানে ঘুরতো—কে কার খবর রাখে? কখনো কখনো অবিশ্যি পথে দেখা হত। বংশী মরে গেছে গাড়ীচাপা পড়ে। ছোট ছেলেটা কোথায় হারিয়ে গেছে তার খোঁজ পাওয়া যায় নি। বংশীর বউ জঘন্য রোগ নিয়ে ফিরে এসেছে। রসুলের কাছে সে কেঁদে পড়ে। ভদ্র উপায়ে সে ভাতের জোগাড় কর্তে পারে নি। অসৎ উপায়েও প্রতিদিন ভাত জোটে নি। অনেকে তাকে ঠকিয়ে পয়সা না দিয়ে চলে গেছে। ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল কোনো মতে। কিন্তু আসবার সময়ে কোথায় হারিয়ে গেল খোঁজ পাওয়া গেল না। বংশীর বউ অসহায় পশুর মতন চিৎকার করে কেঁদে ওঠে।

সিফিলিস! রোগে বিকৃত হয়ে গেছে বংশীর বউয়ের মুখ। তাকে তার বয়সের চেয়ে অনেক বেশী বুড়ী বলে মনে হয়। গ্রামের মেয়েদের মধ্যে তার সৌন্দর্যের দাম ছিল। সবাই আদর করতো তাকে। জহর, খয়রুল, রামরতন—এদের খবর সে দিতে পারে না। বেঁচে আছে কি মরে গেছে তারও কোনো খবর তার জানা নেই।

কয়েকদিন পরে নতুন একদল লোক ক্যাম্পে এসে আশ্রয় নেয়। আমানত রসুলকে খবর দেয় যে তার বাপ এই দলের মধ্যে এসেছে।

আনন্দে রসুলের বুক সাত হাত ফুলে ওঠে। এসেছে—তাহলে তার বাপ ফিরে এসেছে ছেলের কাছে। রসুলের ইচ্ছে যায় বউকে মাথায় তুলে নাচতে। সাকিনা ধরা দেয় না। ভয়ে ও লজ্জায় সে ঘর থেকে পালিয়ে যায়। পেটের মধ্যে সে কিসের যেন স্পন্দন অনুভব করে। একটা নতুন মানুষ পৃথিবীর আলো পাবার জন্যে যেন হাত পা ছুঁড়ে সংগ্রাম করছে।

ক্যাম্পে গিয়ে বাপকে খুঁজে বের কর্তে রসুলের কষ্ট হয়। আগের চেয়ে গত কয়েক মাসে তার বাপ অনেক বদলে গেছে। রোগা হাড্ডিসার চেহারা। বুকের হাড়গুলো এক একটা গোণা যায়। সমস্ত শরীরে আবরণ বলতে মাত্র একটা ন্যাকড়া—গায়ে অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধ।

দরমা-ঘেরা ক্যাম্পের মধ্যে বুড়ো বসে বসে ঝিমোচ্ছে। রসুল কাছে গিয়ে বলে—চিনতে পারো বাপজান। আমি রসুল এসেছি।

বুড়ো বিদ্যুতের মতন লাফিয়ে উঠে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে। বলে—তুই রসুল। হাত দিয়ে ছেলেকে অনুভব করার চেষ্টা করে। হতাশ হয়ে বলে—কই ? কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

কী ? অন্ধ হয়ে গেছ তুমি ? আঁতকে ওঠে রসুল।

হাঁ, হাঁ, ঠিক বলেছিস অন্ধ হয়ে গেছি। আজকাল আর তেমন দেখতে পাই না। সবই অন্ধকার দেখি।

পাথরের মতন বসে থাকে রসুল। তাহলে বাপ তার অন্ধ হয়ে গেছে। হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠে বুড়ো—আমাকে নিয়ে চল্। আমাকে ঘরে নিয়ে চল্ রসুল। আমি আর এখানে থাকব না। ওরা আমাদের অপমান করেছে। বাবুরা আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে ভিখিরী বলে। দু মুঠো ভাত পর্যন্ত দেয় নি।

বাপের কথা শুনে শিউরে ওঠে রসুল। তার পর হাত ধরে বাপকে

তুলে দাঁড় করায়। বুড়োকে দেখে তার লজ্জা হয়। এই কী তার বাপ?

ক্যাম্পের বাবুদের কাছে গিয়ে রসুল বাপকে ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে অনুমতি চায়। বাবুরা বুড়োকে বিদায় দেবার সময়ে একটা নতুন কাপড় দেয়। ন্যাকড়াটা ফেলে দিয়ে বুড়ো কাপড়টা জড়িয়ে নেয় গায়ে।

রসুল আগে আগে চলে। বুড়ো লাঠি ধরে পেছনে পেছনে আসে। পায়ের ঘা-টা আবার নতুন করে আউরে উঠেছে। যেতে যেতে সে নানান্ প্রশ্ন করে রসুলকে। সাকিনা কেমন আছে? মাঠের ধান কতদূর পেকেছে? বংশী খয়রুল ওরা কী ফিরেছে গ্রামে? তার পর শহরের কথা বলে—অনাহারের কথা, অপমানের কথা, আস্তাকুঁড়ের কুকুরের সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের কথা! জীবনের ইতিহাসে শোচনীয় দুর্ঘটনা! বুড়ো ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠে যেতে যেতে। বলে—পিথিমীতে এত বড় দুর্ভিক্ষ আর কেউ দেখে নি রসুল। দেখতে দেখতে চোখের আলো পর্যন্ত তাই নিবে গেল।

ঘরে এসে বুড়ো আনন্দে উপচে ওঠে। থালায় করে সাকিনা খেতে দেয় তাকে। নতুন চালের ভাত, মাছের ঝোল, চুনো মাছের অম্বল। গ্রাম ছেড়ে যাবার পর এই প্রথম সে থালা পেড়ে খেতে বসেছে। খেতে খেতে বুড়ো শহরের কথা মনে করে কাঁদে। গোগ্রাসে ভাতগুলো তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলে পাছে কেউ কেড়ে খেয়ে নেয় এই ভয়ে।

দুপুরে বিশ্রাম নেয় বুড়ো। সন্ধের দিকে রসুল তাকে মাঠে নিয়ে যায়। বুড়ো অস্থির হয়ে উঠেছে—ধান দেখবে। এই ফসলের জন্যে সে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটেছে।

ধানের ভারে ডালগুলো নুয়ে পড়েছে মাটিতে। মাঠের পর মাঠ—দিগন্তব্যাপী ফসলের বন্যায় ঢাকা পড়ে গেছে মাটি। বুড়ো বলে—

কই ? কোথায় ধান ? কিছুই তো দেখছি নে রসুল।

রসুল বাপের হাত ধরে ধানের গোছার কাছে নিয়ে যায়। বুড়ো অনুভব করে। বুকে জড়িয়ে ধরে ধানের আঁটি। মাঠের মধ্যে আনন্দে ছুটোছুটি করে।

এখনও অনেক ধান কাটা বাকী। রসুল আর সাকিনা পেরে ওঠে না। মজুরীতে লোক রেখে কাটায়। তাও রোজ লোক পাওয়া যায় না। সবার ধান মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। সময় মত কাটতে না পারলে ঝরে যাবে মাটিতে।

বাপের আনন্দ দেখে রসুল চঞ্চল হয়ে ওঠে। বুড়ো মাঠ থেকে মাঠে ছুটে বেড়ায়। সাকিনা ধান কাটে রসুলের পাশের মাঠে।

রসুল পেছন থেকে গিয়ে জড়িয়ে ধরে সাকিনাকে। বলে—দেখ্ দেখ্ বাপ কেমন ছুটে বেড়াচ্ছে আনন্দে।

সাকিনা হাসিতে মুখর হয়ে ওঠে।

গাছের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে মাঠের ওপর ছড়িয়ে পড়ে। পুকুর থেকে জল তুলে বাড়ী ফেরে বউ ঝিরা। রসুলের বাপকে দেখে থমকে দাঁড়ায় তারা। খবরাখবর জিজ্ঞেস করে। যারা ফেরে নি তাদের কথা। যারা ফিরেছে তাদের কথাও। সাকিনা কিন্তু নতুন উৎসাহে ধান কেটে যায় ভ্রূক্ষেপহীন। কোথায় যেন মনে মনে গড়ার কাজ চলছে তার। নগ্ন পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে রুক্ষ চুল। রসুল শুধু এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে স্ত্রীর দিকে।

ফজলুকে সঙ্গে করে ভূপতি তদারক করতে আসে তার লঙ্গরখানা। হাতে কালী-পড়া লণ্ঠনটা সঙ্গে নিয়ে আগে আগে এগোয় ফজলু। ভূপতি আসে পেছনে পেছনে। চারদিকে বেশ নিশুতি। গাছপালাকে ঘিরে জমাট বেঁধে উঠেছে অন্ধকার।

দরমা-ঘেরা তাঁবুর মধ্যে ঢুকে একবার থমকে দাঁড়ায় ভূপতি। তার পর টর্চের আলো ফেলে এ-ধার সে-ধার। কি যেন খুঁজতে চেষ্টা করে। আলো দেখে ছেলেমেয়েরা তাদের ছেঁড়া অসংবৃত কাপড় যতটা সম্ভব টেনে দেয় শরীরের ওপর। একজন গায়ে খড় চাপা দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শোয়। ভূপতি কিন্তু ভ্রূক্ষেপহীন ভাবে ঘুরে ঘুরে দেখে। তার পর একটু দুরে গিয়ে মুখিয়ে ওঠে ফজলুর ওপর। বলে—কী? মাত্র এই ক জন! শুনতে পাই রোজ নাকি গড়ে পাঁচ শো করে লোক

খাচ্ছে—তার মধ্যে মেয়েছেলেই নাকি বেশী। তা এই কটি লোকেই বুঝি পুকুর পুকুর খিচুড়ী শেষ করে ফেলছে?

এখানে আর ক জন আছে? লণ্ঠনটা উস্কে দেয় ফজলু। যাদের ঘর দোর আছে তারা ঘরে ফিরে গেছে খিচুড়ী নিয়ে। আবার সকালের দিকে আসবে। এখানে যারা পড়ে আছে তারা বাবু ভিখিরী, খায় দায় আর দিন রাত ঘুমোয়। তাছাড়া সোমত্ত মেয়েগুলোর কি আর খোঁজ আছে কোনো? রাত হতে না হতেই আগানে-বাগানে বেরিয়ে পড়েছে শিকারের সন্ধানে। সবগুলোই বাবু নষ্ট চরিত্রের মেয়ে।

নষ্ট চরিত্রের না তো কি সতী-সাবিত্রীরা আসবে এখানে? ভূপতির গলায় রাগের ঝাঁঝ। সমস্ত দেখে শুনে রাগে গরম হয়ে গেছে তার হাত পা। শেষ পর্যন্ত এই ক জন অপদার্থকে খাওয়াতে গিয়ে ফতুর হয়ে যাবে নাকি সে?

ভয়ে ভয়ে ফজলু বলে—এ ষোলো আনা কথা বলেছেন বাবু আপনি। স্বভাব চরিত্তির ভালো থাকলে আর লঙ্গরখানায় আসতে যাবে কেন।

থাক, সে কথা ভাবতে হবে না তোকে। ধমক দেয় ভূপতি। যে কথা বলেছিলাম, কদ্দুর জোগাড় যন্তর হল তার?

আরও কয়েকটা দিন যাক বাবু। একেবারে বলে কয়ে এসেছি। ওরা যেতে তৈরী। কেবল বাগড়া দিচ্ছে বুড়ীটা। বলে—ঘর ছেড়ে যাবে কোথায়? এখানে উপোস করে থাকে তাও ভালো। তাই বলে শহরে গিয়ে কি আতান্তরে পড়বে তার ঠিক কি? বুঝলাম তোর বাবু না হয় পরোপকারী লোক। শহরের সব লোক তো তাই বলে সমান না। কে কখন ফুসলিয়ে নিয়ে যাবে, ধরে রাখতে পারবি তখন?

মাঝি পাড়ার পদ্মাবতীর বাপ-মা মরা নাতনী দুটোর ওপর ভূপতির নজর অনেক দিন থেকে। কিছু বলতে গেলেই পদ্মাবতী বাগড়া দেয়। ওদিকে

মেয়ে দুটো দামড়ে বেড়ায় সারাটা পাড়া, তাতে কোনো বাধা দেয় না পদ্মাবতী। এক বেলা খেয়ে দিন কাটছে। ভূপতি তাই তার কলকাতার বাড়ীতে চাকরী দিতে রাজি হয়েছে দুজনকে। বুড়ীর কিন্তু নাতনীদের শহরে পাঠাতে সাহস হয় না। ফজলুকে বলে—আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল না। সমস্ত হাঙ্গামা মিটে যায় তাহলে। কথাটা হেসে উঁড়িয়ে দেয় ফজলু। যেন আমলেই আনতে চায় না।

ভূপতির ভুরু দুটো কুটীল হয়ে ওঠে চিন্তায়। বলে—বেশী গরজ দেখাস নি আর। দু দিন গেলে আপনিই পিছু পিছু আসবে লেড়ী কুত্তার মতন। একটু ভেবে বলে—ওদিকে কিন্তু ভালো কাজকর্ম করছে বিলায়েৎ হোসেন। এরি মধ্যে দশ লাট পাঠিয়ে দিয়েছে শহরে। সেখান থেকে চালান দিচ্ছে বিমানঘাঁটিতে।

আরও দুদিন সবুর করুন বাবু। সব ঠিক হয়ে যাবে। লোকজন লাগিয়ে দিয়েছি দু একটা। লোচন, হরিলাল ওরা গেছে ধান কিনতে। ফেরবার পথে কিছু খোঁজ আনবে হয়ত।

হাঁ হাঁ, আজই বিকেলে ফিরেছে হরিলাল। এতক্ষণে বাড়ীতে এসে অপেক্ষা করছে বোধ হয়। তাড়াতাড়ি না যেতে পারলে চলে যেতে পারে। ভূপতি তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বালিয়ে বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে যেতে যেতে বলে—আজ আবার গফুর আসবে। কত রাতে পৌছবে কে জানে। তোকে কিন্তু ঘাটে থাকতে হবে ফজলু। ভিড়লেই খবরটা দিবি। বুঝলি? ভূপতি অদৃশ্য হয়ে যায় অন্ধকারে। কেবল দেখা যায় টর্চের আলো দূরের গাছপালায় লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

ভূপতি চলে যেতেই সাহস বেড়ে যায় কাসেমের। বলে—কি রে ফজলু, বাবু এসেছিল বুঝি? তা, কিছু বলল নাকি কাজকর্মের কথা?

চুপ থাক। ধমক দেয় ফজলু। কাজকর্ম আবার কি? ঘাটের মড়া, কী কাজ হবে তোর দ্বারা?

কী বললি, ঘাটের মড়া? বড় লম্বা লম্বা কথা বলছিস আজকাল দেখি। জোয়ান বয়সে এই হাতে ইয়া বড় বড় বৈঠা মেরেছি, জানিস। কাসেম তার থলথলে মাংস পেশীর দিকে ফজলুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বলে—চণ্ডী কেষ্ট হাঁ করে তাকিয়ে থাকতো আমার না-য়ের পানে। বৈঠা ফেলতে হত না, আপনি ফর ফর করে উড়ে যেত আমার নাও।

থাক মুরোদ তো কত। তাই সম্বল বলতে দাঁড়িয়েছে ঐ হাড় জিরজিরে পাঁজরা। বলে রেখেছি বাবুকে। দরকার হলেই খবর দেবে। বেশী ঘ্যান্ ঘ্যান্ করলে কিন্তু এখান থেকে খেদিয়ে দেবে দু দিন বাদে।

ভয়ে কোনো উত্তর দেয় না কাসেম। আস্তে আস্তে উল্টো দিকে মুখ করে শুয়ে পড়ে। যেন ঘুম পেয়েছে এমনি ভাব। তার পাশে উলঙ্গ অর্ধ-উলঙ্গ মাংসপিণ্ডরাও ঘুমোবার ভাণ করে শুয়ে আছে। একটা অনাথ শিশু প্রলাপ বকছে জ্বরের ঘোরে। খেতে চাইছে। ষাট বছরের বুড়ো রহিম আর থাকতে পারে না। কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসে। বলে—শুনছো কর্তাবাবু, বাছার মুখে ফেন খিচুড়ী যা হয় দাও। খিদেয় কাতরাচ্ছে কেমন ধারা।

চুপ কর। তোমাকে আর উপদেশ দিতে হয় না। খিচুড়ী খেয়ে মেয়েটা যমের বাড়ী যাক আর কি?

ধমক খেয়ে শুয়ে পড়ে রহিম। তার পর তার নাতনীর অনাবৃত শরীরের ওপর ছেঁড়া আলোয়ানটা ভালো করে ঢেকে দেয়। শেষ রাতে হিম পড়ে পাছে ঠাণ্ডা লাগে।

লঙ্গরখানাটা চলে ভূপতি হাজরার পয়সায়। চালের গুদোমে অনেকদিন থেকে খুদ কুঁড়ো জমেছিল স্তূপাকার হয়ে। ভূপতি তা এমনি না বিলিয়েঃ দিয়ে লঙ্গরখানা খুলে গরীবদের খাওয়ার একটা আস্তানা করে দিয়েছে। ফজলুই দেখাশোনা করে। সকাল দশটায় উনুন ধরে। রান্না নামে দুপুর তিনটেয়ে। রান্না বলতে চাল-ডাল-আটার একটা তরল সরবৎ। দুটো বাজতে না বাজতে মালসা হাতে পঙ্গপালের মতন ভীড় জমে। অনেকেই খেয়ে দেয়ে বাড়ী ফিরে যায়। সময়ে সময়ে ভগবানের কাছে ভূপতির দীর্ঘায়ু কামনা করে। যাহোক অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে তো এতগুলো লোককে।

ওদিকে কিন্তু পুরো দমে ভূপতির কাজ চলে। গ্রামান্তর থেকে চাল আসে বস্তা বোঝাই। লুটের ভয়ে দুজন লোক পাহারা দিতে দিতে আসে। তার পর বস্তাগুলো পদ্মা পার হয়ে জেলা শহরের স্টেশন থেকে চালান যায় কলকাতায়.........একজনের গুদোম থেকে অন্য একজনের গুদোমে। অন্ধ গলির ঠিকানা বের কর্তে গেলে হাঁপিয়ে উঠতে হয়। জনমানবহীন গলির সদর দরজায় নেপালী দরোয়ান দাঁড়িয়ে। সঙ্গীনের ফলা দেখলেই বুকে কাঁপুনি ধরে।

ভূপতির পুর্বপুরুষরা গ্রামেই মানুষ। এখন না হয় ভূপতি বাড়ী তুলেছে শহরে। কিন্তু বিস্তর জমি পড়ে আছে গ্রামে। চাষীরা চাষবাস করে। মোটা অংশটা পড়ে ভূপতির ভাগে। তিন পুরুষ ধরে বিচক্ষণ ব্যবসাদারী বিদ্যেটা মগজে ঢুকিয়েছে। তাই নদীর মাছ, ক্ষেতের তরিতরকারি কিছুই বাদ যায় না। লোকজন ঠিক করা আছে। একজন গুছিয়ে গাছিয়ে চালান দেয়; আর একজন সেগুলো খালাস করিয়ে নেয় শিয়ালদা থেকে। কোনো হাঙ্গামা নেই। কর্মচারীরাই সমস্ত কিছু চালিয়ে নেয়।

গ্রামে যে দুটো নতুন কোটা বাড়ী, তার মধ্যে একটা হল ভূপতি হাজরার অন্যটা হল রমাপতি দাশের। পূজো পার্বণে, বিশেষ উপলক্ষে বা ব্যবসার প্রয়োজনে ভূপতি গ্রামে আসে। চারদিক বেয়ে চেয়ে দেখে। কার জমিতে কত ধান হল। কে খড় ছাইলো তার ভাঙা চালে। কার পরিবার ভেঙে দু ভাগ হয়ে গেল। তাছাড়া ভূপতি আর রমাপতির মধ্যে প্রায়ই প্রতিযোগিতা হয়। বাজি রেখে তারা মাল কেনে। তিন পুরুষ ধরে যে তারা বিচক্ষণ ব্যবসাদার, এ কথা ভুলতে পারে না ভূপতি। তাই দু পক্ষের লোকজনের মধ্যে ঝগড়া বাধে, লাঠালাঠি হয়। মাঝিরা গলা উঁচিয়ে গালাগালি করে। ধর্ম, আদালত, পুলিশ—কোনো ভয়ই বাদ যায় না। আবার সব ঠিক হয়ে যায়। যেন কোনো কিছুই হয় নি এমনি সকলের ভাব।

লোচন, হরিলাল, ক্ষেত্র—ওরা গ্রামে গ্রামে ঘোরে। ভূপতি নির্দেশ দিয়েই রেখে দিয়েছে—যার ঘরে যা পাবি কিনে নিবি। গত বছরের আমন কিছু জমিয়ে রেখেছে চাষীরা। তার পর আউস উঠেছে নতুন, বুঝলি। দু পয়সা বেশী নেয় নিক্—মাল পাওয়া নিয়ে হচ্ছে কথা। কিন্তু কড়া নজর রাখবি ওজনের ওপর। ঐ থেকেই বেরিয়ে আসবে বেশী টাকাটা।

লক্ষ্মণ বাড়ী নেই। এই সুযোগে হরিলাল তার মাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করে—কি গো লক্ষ্মণের মা, বলি বেচবে নাকি কিছু ধান চাল?

আহা! শোনো মুখপোড়া ছোঁড়ার কথা। ধান চাল বেচে দি আর আমার কচি নাতি নাতনীরা উপোস করে মরুক আর কি। বলি এ কেমন ধারা কথা বলছো জানকীর পো? লক্ষ্মণের মা মুখিয়ে ওঠে উঠোনে বড়ি দিতে দিতে।

ছি, ছি, গোসা করলে নাকি লক্ষ্মণের মা। হরিলাল ব্যথিত হয়ে বলে।

এমনি জিজ্ঞেস করলাম কথার কথা। শুনলাম আউসের জবর ফসল ঘরে তুলছো এবার। তাই কিছু না হয় ছেড়েই-দিলে মোটা দামে। আবার দাম কমলে তো কেউ কিনে নিতে বারণ করছে না।

মস্করা হচ্ছে বুড়ীর সঙ্গে? লক্ষ্মণের মা শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ায়।

তোমার সঙ্গে মস্করা করব কি লক্ষ্মণের মা? বিব্রত হয়ে উত্তর দেয় হরিলাল।

মস্করা নয়? বুড়ী রাগে ভুরু কোঁচকায়। গাঁ কে গাঁ 'চাল নেই, চাল নেই' করে হাহাকার করছে আর তুমি আসছো হাঁড়ির খবর জানতে! বলি ক টাকা মাইনা দেয় সেজবাবু? আমার নাতি নাতনী উপোস করে থাকলে তুমি খেতে দিতে আসবে নাকি, জানকীর পো?

ষাট্ ষাট্, খামখা উপোসের কথা তুলছো কেন? সরকার থেকে ধান চাল কিনছে কিনা তাই লাফ দিয়ে দিয়ে উঠছে ধানের দর। যেমনি কেনা বন্ধ করবে দু দিন বাদে, ওমনি তর তর করে নেমে আসবে হাঁটুর নীচে। তখন যত পারো প্রাণ ভরে কিনে রেখো। বুঝলে কিনা, ভেতরকার খবর পেলাম, তাই ভাবলাম বলি যাই, খবরটা একবার নিয়ে যাই লক্ষ্মণের ঠেঙে। লক্ষ্মণ নেই তাই তোমাকেই বলে গেলাম, লক্ষ্মণের মা।

কথাগুলোয় কাজ হয়েছে বুড়ীর মনে। তাই সাধারণভাবে আবার বড়ি দিতে থাকে গোবর-নিকোনো উঠোনে। বলে—ভেতরকার খবর বুঝি? কই লক্ষ্মণ তো বলল না কিছু?

লক্ষ্মণ কি আর জানে! খাস এস ডি ও সাহেবের আপিসের খবর! হরিলাল আপ্যায়িত করে বুড়ীকে। আমি কেন কালী মাইতি, পাটল দাশ, ওদের জিজ্ঞেস করে দেখ না ব্যাপারটা। আগে ভাগে ধান চাল বেচে দিচ্ছে চড়া দামে।

তা বাছা, কত করে নিচ্ছ তোমরা। উৎসাহ দেখায় বুড়ী।

কত করে আবার কি? লক্ষ্মণ যা বলবে তাই হবে। ন্যায্য দাম বললে দরাদরি কর্তে যাবো কেন মিছামিছি। ভারিক্কী চালে উত্তর দেয় হরিলাল।

হাজার কথার এক কথা বলেছ জানকীর পো। লক্ষ্মণের মা খুসীতে উপচে ওঠে। আচ্ছা কাল একবার সময় করে এসো এদিকে। লক্ষ্মণকে বলে দেখব কি বলে।

বাজার গরম থাকতে থাকতে ঝেড়ে দাও যা বাড়তি আছে, বুঝলে লক্ষ্মণের মা। নইলে বাজার কমতে শুরু করলে আর ঠাঁইটুকু পাবে না দাঁড়াবার। হরিলাল ধীরে ধীরে সাঁকোটা পেরিয়ে উত্তরমুখো আল ধরে চলতে শুরু করে। পোয়া মাইল পথ গেলে তবে করিমের ঘর·········করমচার বনের মাঝখানে ছ্যাচা বেড়ার চালা।

হাতে লণ্ঠন নিয়ে ঘাটের ধারে একটা ঢিপির ওপর বসে থাকে ফজলু। কে জানে, কত রাতে আসবে গফুরের নৌকো? এখন থেকে রাত জেগে বসে থাকো তার অপেক্ষায়।

অন্ধকারে স্পষ্ট ঠাওর হয় না। শুধু শব্দ শোনা যায়। ছপ্ ছপ্ করে দাঁড় ফেলার শব্দ। এদিক ওদিক্ উধাও হয়ে যাচ্ছে নৌকোগুলো পলকা পালকের মতন। পাতলা এক টুকরো চাঁদ উঠেছে তেরছা হয়ে। নদীর জলে এলোমেলো ছায়া পড়েছে তার। জায়গায়ে জায়গায়ে সোনার মতন ঝকঝক করছে জলের ঢেউ। দূরে শেয়ালের চিৎকার আর মানুষের অস্ফুট কাতরানি। আরও দূরে—ওপারের শহরে আলো দেখা যায় ফুলঝুরির মতন। কোথায় যেন ভাটিয়ালির সুর—টানা টানা কান্নার মতন।

লণ্ঠনটা কমিয়ে দিয়ে লাঠি হাতে ফজলু পাহারা দেয় একমনে। দু জন পাগল আপন মনে বিড় বিড় করছে গাছতলায় বসে।

তার পর জলদ কী করল জানিস? হাঁসুলিটা গলা থেকে খুলে নিয়ে ঝুপ করে ঢুকে পড়ল কাশ বনে। কাঁদন তখন ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। সে কী কান্না মাইরি! তুই পর্যন্ত পীরিতে পড়ে যেতিস। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। প্রথম পাগল শব্দ করে হেসে ওঠে।

হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ, নাড়িভুঁড়ি পাক খেয়ে ওঠে এমনি ভাবে হাসে দ্বিতীয় পাগল।

মাইরি, দেখ না একবার বলে কয়ে। আমি সঙ্গে যা'ব খন। নওগাঁ ছাড়িয়ে পাঁচ কোশ পথ। হোই চণ্ডীতলা, রথতলা ছাড়িয়ে যে মাঠটা, সেই মাঠে।

পাঁচ কোশ পথ বলিস কী তুই? দ্বিতীয় পাগলটা ঘড়ঘড়ে গলায় বলে। তবে তো মোটর গাড়ী নিতে হয় একটা। তুই কী বলিস বক্কেশ্বর?

মোটর গাড়ীর দরকার কি। এমনি পয়দলে চলে যাবি গুটি গুটি।

খোঁড়া পা নিয়ে পয়দলে যাবো কি করে লক্ষ্মীছাড়া? হি হি করে হাসে দ্বিতীয় পাগল। খোঁড়াতে দেখলে হয়ত কাঁদন খেদিয়ে দেবে দুর দুর করে।

বেশ তবে চল্ কাঁধে করে নিয়ে যাবো তোকে। নদীটা পেরিয়ে উটপাখীর মতন চলে যাবো পাঁচ কোশ পথ। তুই কাঁধে উঠে বস ঝট্ করে। বক্কেশ্বর কুঁজো হয়ে উঠে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় পাগল বক্কেশ্বরের কাঁধের ওপর একটা হাত দিয়ে পিঠের ওপর চড়তে চেষ্টা করে ঘোড়ার মতন। পড়তে পড়তে শেষ পর্যন্ত উঠে বসে জুৎসই করে। তার পর বলে—চল্ চল্ আর দাঁড়াস নি।

প্রথম পাগলটা এগোয় থপ্ থপ্ করে। দ্বিতীয় পাগল হাসে গলা

ছেড়ে—হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ। আবার টাকরায় জিব ছুঁইয়ে আওয়াজ করে যেন ঘোড়া হাঁকিয়ে হাটে চলেছে অর্জুন সাহা।

ফজলুর তন্দ্রা আসে। কিন্তু পাগলদের হাসি শুনে ঘুম ভেঙে যায় বার বার। এক সময়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় সে। লগি ঠেলতে ঠেলতে একটা নৌকো এসে ঘাটে ভিড়ছে যেন।

লগিটা ভেতরে রেখে একজন লোক নৌকো ছেড়ে এগিয়ে আসে ফজলুর দিকে। ফিস ফিস বলে—কে ফজলু মিঞা নাকি। যা যা ঝটপট খবর দে কর্তাবাবুকে। দেরী হলে বিপদে পড়তে হতে পারে। এতটা পথ এসেছে—একটা কুটো কাটে নি বেচারীরা?

ফজলু কোনো কথা বলে না। এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে লণ্ঠন। বড় বড় পা ফেলে সে বাবুর বাড়ীর দিকে এগোয়। জরুরী খবর সঙ্গে নিয়ে ডাক-পিওন চলেছে যেন। ঝম্ ঝম্ করে ঝুমঝুমি বাজছে তার পায়ের তালে তালে।

টিনের ডিবে থেকে খৈনি বের করে গফুর তার সঙ্গীকে লক্ষ্য করে বলে—এ সব আমাদের কাজ না, বুঝলি বরকত। মেয়েলোকের ব্যবসা,—কখন কানে যাবে দারোগাবাবুর আর ওমনি বেড়ী পড়বে হাতে। ট্যাকার লোভে শ্রীঘর বাস কর্তে হবে শেষ কালে।

রাখো। শ্রীঘর না আর কিছু। হুঁকোয় টান দিতে দিতে ডাক ছাড়ে বরকত। আর যেন কেউ করছে না এ কাজ? তোমার যেমন কথা। মেয়েলোক রাস্তায় না খেয়ে মরছিল, আমরা আশ্রয় দিয়েছি এই তো। তা কী হয়েছে তাতে করে? এ তো পরোপকারের কাজ!

পরোপকার! ভারী গলায় হাসে গফুর। মেয়েলোকের সতীত্ব নিয়ে পরোপকার! এ তুই বলিস কি বরকত? তার পর প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে নেয় গফুর। বলে—কি বলিস, ঘুমিয়ে পড়েছে সব, না?

ঘুমিয়ে পড়বে না? রাত কত হল খেয়াল আছে তা? ছইয়ের ওপর উঠে বসে গফুরের সঙ্গী।

আহা, সেই কোন্ সকালে ভাত খেয়েছে বেচারীরা! খিদের জ্বালায় ছটফট করছে হয়ত। সমবেদনায় ভারী হয়ে ওঠে গফুরের গলা।

ভাত এবার বাবুরাই দেবেন। আমাদের দেনা পাওনা মিটে গেলে বেঁচে যাই এখন। ওদিকে হরিচরণের বউ বাপের বাড়ী যাবে খেয়াল আছে তো। আগাম দিয়ে রেখেছে ভাড়া। সময় মত না গিয়ে পৌছতে পারলে হাঙ্গামা হবে খন দেখে নিও।

হাঙ্গামা হতে যাবে কেন? এবার তো যাবো হাওয়ার সাথে সাথে। বাদাম তুলে দেব, ফর ফর করে উড়তে উড়তে চলে যাবো সারাটা পথ।

ছই থেকে সটান ঘাটের ওপর নেমে আসে বরকত। হুঁকোতে টান দেয় কয়েকটা টেনে টেনে। নৌকোর মধ্যে থেকে ফিসফিসে কথা শোনা যায় আশ্রয়প্রার্থিনীদের। বোধহয় খিদেতে গজরাচ্ছে।

গফুর বলে—বদনাতে কিছু বাসি ভাত রাখা আছে সকালের, দিয়ে দে বেচারীদের। পরাণ ঠাণ্ডা করুক দু গ্রাস খেয়ে।

বরকত নড়ে না। প্রাণ ভরে ধোঁয়া ছাড়ে শব্দ করে করে।

গফুর বিরক্ত হয়ে বলে—তোর কি, তুই তো এনেই খালাস। এখন যা পাপ লাগবার, লাগবে আমার।

কয়েক গজ দূরে আলো দেখা যায় লণ্ঠনের। ভূপতি, ফজলু ও আরও কয়েকজন ঘাটের দিকে আসছে হন হন করে।

এই যে এসে পড়েছেন, সেজকর্তা। নিশ্চিন্ত হয়ে বরকত উঠে দাঁড়ায়।

আসুন, আসুন কর্তাবাবু। গফুর অভ্যর্থনা জানায়। বড় রাত হয়ে গেল। অনেকটা পথ গুণ টেনে এলাম কি না। কি জবর হাওয়া দিয়েছে উলটো দিকে!

হুঁ তার পর কি রকম হল দেখি। নৌকোর দিকে পা বাড়ায় ভূপতি।

আলোটা তুলে নিয়ে গফুর ভূপতিকে নৌকোর ভেতরে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে দুজনে বেরিয়ে আসে আস্তে আস্তে।

ভূপতি বলে—ঝট্‌পট্, সরিয়ে ফেল লাশটাকে। না খেয়ে খেয়ে শরীরে কিছু ছিল না, তাই সহ্য করতে পারে নি ধকল। কি হাড়সার চেহারা রে বাবা।

আমি কিন্তু দশ টাকা দিয়ে ছুঁড়ীটাকে নিয়ে এলাম তার বাপের কাছ থেকে! কাতর হয়ে পড়ে গফুর।

দেখে শুনে আনতে হয়। মাঝখান থেকে খামখা লোকসান গেল টাকা কটা। ভূপতির গলায় তীক্ষ্ণ শোনায় কথাগুলো।

তাই কি দেয় দশ টাকায়। কত মারামারি দর কষাকষি করে তবে ছাড়ল পিতাম্বর। চোখের জল ফেলতে বাকী রাখে গফুর।

হয়েছে, হয়েছে। যা লোকসান যাবার তা গেছে। এখন দশজনের কানে গেলে হাঙ্গামায় পড়তে হবে। জলে ভাসিয়ে দে ঝট্‌পট্ করে। শকুন টকুন টেনে নিয়ে যাবে খন। অসহিষ্ণুতার প্রমাণ দেয় ভূপতি।

গফুর আর বরকত লাশটাকে টেনে বাইরে বের করে। তার পর নৌকো থেকে ঠেলা মেরে জলে ফেলে দেয়। ঝপ্ ঝপ্। শব্দ হয় কয়েকবার। স্রোতের টানে মৃতদেহ দূরে চলে যায় ছিটকে।

ফজলু ও আরও কয়েকজন নৌকোর ভেতর থেকে নামিয়ে আনে বাকী মেয়েদের। তাদের মুখে কথা নেই। ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে সমস্ত শরীর! ফজলুকে নির্দেশ দেয় ভূপতি। বলে—এদের তুই নিয়ে যা ফজলু। সাবধানে নিয়ে যাবি কিন্তু। আর আস্তাবলের পাশের ঘরটায়—খড় বিচালি থাকে যেখানে, সেখানে জায়গা করে দিবি থাকবার।

তার পর গফুরের হাতে এক তাড়া কাগজের নোট গুঁজে দিয়ে বলে—

এই নে। তোর এবারকার সমস্ত মিটিয়ে দিলাম। আর আগাম দিলাম বিশ টাকা, বুঝলি। যেমন সুবিধে হবে, আমায় খবর দিবি সময়মত।

লণ্ঠনের অল্প আলোয় নোটগুলো গুণতে গুণতে চিৎকার করে ওঠে গফুর —এ কী দিলেন কর্তাবাবু? এ তো আমার নিজেরই দাম উঠল না। নিজের ট্যাঁক থেকে পয়সা দিয়ে কিনেছি বাবু। রাস্তার ভিখিরী না, যে না-য়ে করে তুলে এনেছি।

কেন ও টাকায় মন উঠল না বুঝি। ভূপতির গলা শ্লেষে ধারালো হয়ে ওঠে। পয়সা তোর মুখ দেখে দেব, না জিনিস দেখে? মেয়েমানুষ তো না, যেন হাড়ের পুঁটলি। তাও সবার বয়স থাকলে বুঝতাম। ওদের পুষতে, বড় কর্তে কত টাকা বেরিয়ে যাবে খবর রাখিস তার?

অত শত বুঝি না বাবু। উত্তর দেয় বরকত। মাল আপনার, কারবার আপনার—এ ব্যবসা আমাদের চোদ্দ পুরুষেও কেউ করে নি।

ব্যবসা কিসের? বরকত যেন সাপের ওপর পা দিয়েছে এমনি ভাবে ফোঁস করে ওঠে ভূপতি। না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে, ভিক্ষে করছে রাস্তায় রাস্তায়, তাই ঠাঁই করে দিলাম ঘরে আর ওমনি ব্যবসা হয়ে গেল তোদের কাছে! মুখে আটকায় না কিছু, না?

যাক গে ও সব কথা। এখন টাকাটা দিয়ে দেন, চলে যাই আমরা। সওয়ারী নিয়ে যেতে হবে অন্য জায়গায়ে।

যা ন্যায্য তাতো দিয়েছি গফুরের হাতে। আবার কিসের টাকা?

তবে এ টাকাও ফিরিয়ে নেন বাবু। অমন কারবার করি না আমরা। কত দালাল ভ্যান্ ভ্যান্ করছে শহর বাজারে। গেলেই লুফে নেবে খন। গফুরও নাছোড়বান্দা।

মাথাটা সব সময়ে গরম করেই আছিস দেখছি। রাগ হঠাৎ জল হয়ে

যায় ভূপতির। এই নে।· আর জ্বালাস নি। ভূপতি দশ টাকার দুটো নোট ছুঁড়ে দেয় গফুরের দিকে।

বদর, বদর, বদর। ও দিকে নৌকো খুলে দিয়েছে গফুর। ভূপতিও টর্চ হাতে বাড়ী ফিরে চলেছে একা একা। পায়ের নীচে জমিটা এবড়ো খেবড়ো আগাগোড়া। কোথাও পাথর, কোথাও মানুষের মাথার খুলি। শকুনরা খেয়ে ফেলেছে সমস্তটুকু। পড়ে আছে শুধু কয়েকটা হাড়।
রাস্তার ডানদিকে আলের ধারে কিসের যেন শব্দ! শুয়োরে মাটি খুঁড়ছে বোধহয়। ভূপতি টর্চের আলো ফেলে কৌতূহলী হয়ে। ক্ষেতময় আলুর সবুজ চারা। আলের ওপর খুব সাবধানে পা রাখে ভূপতি। ছি ছি, লজ্জায় পিছু হটে আসতে হয় তাকে পর ক্ষণেই। খালের ধার ঘেঁষে কারা যেন শুয়ে আছে। শাড়ীর রঙিন পাড়ের প্রান্তটুকু চোখে পড়ে শুধু।
টর্চটা নিবিয়ে হন হন করে পা চালায় ভূপতি। জোর হাওয়া দিয়েছে : ধাক্কা খেয়ে সাঁ সাঁ করছে গাছের ডালপালা।

স্টিমার-ঘাট থেকে মাইল খানিক দূরেই পাহাড়—এলোমেলো, উঁচু নীচু। কোনো জায়গায়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে গর্ত হয়ে গেছে অনেকটা; আবার কোথাও কোথাও শীর্ণ উপত্যকা কয়েক হাত অগ্রসর হয়ে থেমে গিয়েছে। পাহাড়ের গায়ে মানুষের বসতি নেই বললেই চলে। ঘাটের ধারে কিছু মানুষ বাস করে, তা ছাড়া দু মাইলের মধ্যে জনমানব চোখে পড়ে না। চোখে পড়ে শুধু জঙ্গল আর সুবিশাল ধূ ধূ করা বালির প্রান্তর। দল বেঁধে বালিহাঁসগুলো সাঁ সাঁ করে উড়ে বেড়ায় এপার থেকে ওপার। হাওয়া উঠলে বালির ঘূর্ণি ওঠে। নিরক্ত ধূসর পাথুরে কণাগুলো ছুটে বেড়ায় ঊর্ধ্বশ্বাসে। লোকেরা ঝাপ ফেলে চালার মধ্যে লুকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। হাওয়া কমলে তবে বাইরে বেরোয়। আকাশে তখন ফ্যাকাশে নীল রং।

চোখের সামনে দিগন্ত-ছোঁয়া নদীর বিস্তৃতি। উজান বেয়ে বেরিয়ে পড়েছে কতকগুলো নৌকো। বাদামগুলো কাঁপছে হাওয়ায়। ভাটির নৌকো গুণ টেনে চলেছে প্রাণপণে। জলের শব্দগুলো বিদ্যুতের মতন

ঢেউয়ের তালে তালে দূরে ভেসে চলেছে। বাদাম-দেয়া নাওগুলো পাল্লা দিয়ে চলেছে এগিয়ে। ভাটির নাও দেখে তাদের করুণা হয়। গুণ টেনে কদ্দূর যাবে আর?

সেই পাহাড় একদিন হঠাৎ জেগে ওঠে মানুষের পায়ের শব্দে। নতুন করে তাঁবু পড়ে সৈন্যদের। ছয় মাস আগে একবার তাঁবু পড়েছিল পাহাড়ের গায়ে। এক মাস ছিল। তার পর নদীর ঘাট ধরে সোজা উত্তরমুখো পথে সৈন্যেরা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল একদিন দুপুরে। আর আসে নি।

কালো কালো খাকি পোষাক পরা চেহারা। শীর্ণ না-খেতে-পাওয়া শরীর, অনুজ্জ্বল শুকনো মুখ, ক্লান্ত, নিরুৎসাহ পায়ের গতি। সৈন্যেরা দলে দলে বের হয়। চাঁদমারি করে টিলার ওপর। গর্তের মধ্যে ঢোকে, উপত্যকার মধ্যে লুকোয়, নকল যুদ্ধ করে। শত্রুর কাছে ধরা পড়ে, ধরা দেয়। বিউগল্ বাজে, বন্দুকের মর্ম্মভেদী আওয়াজ শোনা যায়। তার পর সব শেষ। দলবেঁধে ফিরে আসে সৈন্যেরা—লেফ্ট রাইট, লেফ্ট রাইট, লেফ্ট, লেফ্ট, লেফ্ট রাইট। ধূ ধূ করা বালির প্রান্তর তাদের এগিয়ে নিয়ে যায় গ্রামের পথে, স্টিমার-ঘাটের দোকানগুলোয়।

ঘাট থেকে এক ক্রোশ পথ পেরিয়ে গ্রাম। শ্রীহীন ছাড়া ছাড়া টিনের চালা। অনেকগুলি ভেঙে পড়েছে। অনেকগুলি উড়ে গেছে ঝড়ে। আবার খালি পড়ে আছে বহু ঘর। ঘরের মালিক নেই। অনেকে না খেয়ে মরেছে, অনেকে অর্থের খোঁজে উধাও হয়েছে মহকুমায়, ফেরে নি। বেওয়ারিস্ ঘরগুলির কাছ দিয়ে যেতে বুক কাঁপে, ভূতের ভয়ে ছম ছম করে সমস্ত শরীর। মনে হয় না-খেয়ে-মরা লোকগুলোর প্রেতাত্মা এসে ঘাড় মটকে দিয়ে যাবে এক্ষুণি।

গ্রামে খবরটা রটতে সময় লাগে না যে তাঁবু পড়েছে টিলার ওপর। গোরা সৈন্য নয়, কালা সৈন্যই এসেছে এক হাজারের মতন। ছয় মাস আগে যারা এসেছিল, বোধ হয় তারাই এসেছে আবার। খবরটা শুনে ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে যায় সকলের। ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ হয়, ঝাঁপ পড়ে। মেয়েরা সন্তর্পণে ঘর থেকে বেরোয়। কয়েকদিন বন্ধ রাখে মাঠে যাওয়া।

জংলীর মার কানেও খবরটা যায়। ধমফড় করে সে উঠে বসে দাওয়ার ওপর। কী যেন মনে মনে ভাবে অনেকক্ষণ ধরে। হয়ত মৃত স্বামীর কথা, নিজের কথা, জংলীর কথা, সৈন্যদের কথা—জীবনের এলোমেলো অবিন্যস্ত, ছাড়া ছাড়া, ছোট ছোট অধ্যায়। জল ভরে আসে চোখে। পৃথিবীটা ঝাপসা দেখায়।……দরিদ্র, নিরীহ পরিবার। স্বামী, স্ত্রী আর একটা ছেলে। ভাগে চাষ করে ধান আসতো ঘরে। বছরের প্রয়োজনটা মিটতো যেমন করে হোক। জংলী স্টিমার-ঘাটে মাল বইতো। মাঝে মাঝে দু আনি চার আনি পয়সা এনে দিত মার হাতে। সংসার চলত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। একবার সুন্দর জংলীকে কাজ দিতে চেয়েছিল তার নৌকোয়। কাজের মধ্যে হল সুন্দরের ফরমাস খাটা, সওয়ারী পেলে দাঁড় টানা আর মাছ ধরা। খাওয়া পরা বাদে মাসের শেষে কয়েক টাকা পারিশ্রমিক। জালে ভালো রকম মাছ উঠলে কিছু মাছ। জংলীর মা ছেলেকে যেতে দেয় নি। সুন্দরের স্বভাব চরিত্তির নাকি খারাপ। স্ত্রী মারা গিয়ে অবধি রাত বেরাতে নেশা করে কোথায় পড়ে থাকে তার ঠিকানা নেই। তাই ছেলেটাকে বয়ে যেতে দিতে পারবে না জংলীর মা।

তার পর অবস্থা আরও খারাপ হয় আস্তে আস্তে। খাজনা নাকি বাকী পড়ে অনেক। ভিখুর ভাগ থেকে একটা মোটা অংশ বেরিয়ে যায়।

কপালে হাত দেয় ভিখু। মোটা দামে নাকি ধানচাল কিনছে মহাজনরা। তার লোভ হয় সমস্ত সম্বল বেচে দিয়ে আসে। এমন সুযোগ আর হয়ত আসবেই না ভিখুর কাছে। তার পর হঠাৎ নেই, নেই। ঘর খালি, হাট খালি। গোলাভরা ধান যেন কোথায় উঠে গেছে রাতারাতি। ভিখুর উনুনেও আগুন পড়ে না। জংলীর মা গুম হয়ে বসে থাকে। বেশীর ভাগ দিন খালি হতে ফিরে আসে জংলী—মোট নাকি মেলে নি। ভিখু সন্দেহ করে জংলীকে। মোট বওয়া পয়সায় জংলী নিশ্চয়ই উদরপূর্তি করে এসেছে স্টিমার-ঘাটের দোকানে।

ভিখু একদিন হঠাৎ কোমরের কাপড় গলায় বেঁধে আত্মহত্যা করে। সৈন্যরাও এসে তাঁবু ফেলে পাহাড়ের গায়ে। সারা গ্রাম গম গম করে তাদের পায়ের শব্দে। জংলীর মা ছেলের দৃষ্টি এড়িয়ে ভীড়ের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। কালো কালো মানুষ। রুক্ষ, তামার মতন চেহারা। অন্ধকারে জঙ্গলের একধারে দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকে জংলীর মা। তার পর ভূতের মতন টলতে টলতে বাড়ী যায় এক সময়ে। অপরিচ্ছন্ন আলোয় করকরে নতুন নোটখানা নেড়ে চেড়ে দেখে একবার। চারদিকের আগল দেয়া দরজা খুলে গেছে। অন্ধকার ছিদ্রপথে দেখা যাচ্ছে আলোর ঝলকানি!

তার পর এমনি প্রতিদিন। স্খলিত পায়ে টিলার ধারে যায় জংলীর মা। আলকাতরার মতন কালো অন্ধকার। বুক কাঁপানো গভীর জঙ্গল। ভয়ে বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে। ফুসফুসের ওঠা নামা বন্ধ হয় আসতে চায়। অন্ধকারে ঠাওর করা যায় না মুখগুলো। কেবল কালো কালো শীর্ণ শরীরের তাকত জংলীর মা সর্বাঙ্গে অনুভব করে। কারো মুখে বিড়ির গন্ধ। আবার কারো পায়োরিয়া। তাদের মুখের দুষিত গন্ধে হাঁপিয়ে উঠতে হয়।

নতুন করকরে নোটগুলো মাটির নীচে পুতে রাখে জংলীর মা। অসময়ে কাজ দেবে। তার পর ছেঁড়া শাড়ীটা ফেলে দিয়ে নতুন ডুরে শাড়ী কেনে। চিরুণী দিয়ে জট পড়া চুলগুলো আঁচড়ে নেয়। সৈন্যদের-দেয়া বাহারি তেল দিয়ে জব্‌জবে চুল বাঁধে। হাসিতে এলিয়ে পড়ে কথায় কথায়।

হঠাৎ একদিন ছেদ পড়ে। জংলীর মা পাহাড়ের ধারে এসে ফিরে যায়। ওরা নেই। একদিনের মধ্যে সমস্ত তাঁবুগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে টিলা ছেড়ে। চারদিকে সাড়াশব্দহীন নিস্তব্দতা। ঘাটে এসে দাঁড়ায় জংলীর মা। পানের দোকান থেকে পঞ্চানন ইশারা করে ডাকে। বলে—এদিকে একটু দাঁড়িয়ে যাও গো জংলীর মা। পান খেয়ে যাও এক খিলি। বলি যাবার সময়ে কানে কানে কিছু বলে গেল নাকি হনুমানগুলো ?

কি জানি ? কখন গেল তাই তো জানলাম না। বিস্ময়ে ও ভয়ে থম থম করে জংলীর মার মুখ।

তাই নাকি ! তাও বুঝি বলে যায় নি যাবার সময়ে। পঞ্চানন কালো কালো দাঁত বের করে হাসে। আরে এই তো দুপুরবেলাই দেখলাম লেফ্‌ট রাইট, লেফ্‌ট রাইট কর্তে কর্তে উত্তরমুখো চলে গেল হনুমানগুলো।

দুপুরবেলাই চলে গেল নাকি ? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে জংলীর মা।

হাঁ গো, জরুরী হুকুম এসেছিল নাকি ওপরআলার কাছ থেকে। পঞ্চানন পানের খিলিটা এগিয়ে দেয় সামনের দিকে। জংলীর মার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে লোলুপ দৃষ্টিতে। ঈস্‌ এক মাসের মধ্যে কী রকম মোটাই না হয়েছে সে ! সমস্ত শরীরে একটা চটক এসেছে তেলা তেলা।

জংলীর মার সেই মাটিতে পোতা নোটগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। নতুন করে ইচ্ছে যায় সংসার পাতবার। ঝালিয়ে নিতে ইচ্ছে করে চোয়াল বের করা ঘরখানা। দেখবে নাকি পঞ্চাননের মতিগতি একবার পরখ করে। একদিন সেই তো তাকে নিয়ে ঘর বাঁধবার জন্যে পায়ে ধরে সেধেছিল। কিন্তু হঠাৎ পেছিয়ে যায় জংলীর মা। মনে হয় পঞ্চানন আর হয়ত কানেই তুলবে না কথাটা। আর কি ঘর বাঁধা চলে তাকে নিয়ে!

এক সময়ে পঞ্চানন ফিস ফিস করে বলে, যাও যাও বাড়ী যাও জংলীর মা। রাত অনেক হল। এখানে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে লোকে কথা বলাবলি করবে আবার।

হঠাৎ হুঁস হয় তার। পাথরের মতন পা দুটো সামনের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তার ইচ্ছে করে নতুন ডুরে শাড়ীটা ফেলে দিয়ে পুরোনো চিরকুট কাপড়টা গায়ে জড়িয়ে নেয়। সেই বেশে তাকে দেখলে দয়া হবে, করুণা হবে মানুষের।

ধূ ধূ করে সময়। একটা নয় ছটা মাস বেরিয়ে যায় একটানা। এরিমধ্যে মাটির তলা থেকে টাকাগুলো সরিয়ে ফেলে জংলী। করকরে নতুন কাগজের টাকা! জংলীর মা সমস্ত ঘরখানা ওলট পালট করে ফেলেও হদিস পায় না টাকার। ফুটো চালা থেকে হু হু করে বর্ষার জল আসে। মাথা নীচু করে বসে থাকে জংলীর মা। পরণে শতছিন্ন তেলচিটে একটা কাপড়। লজ্জায় বাইরে বেরুনো বন্ধ।

এমনি সময়ে খবর যায় জংলীর মার কানে তাঁবু পড়েছে পাহাড়ের ধারে। ধড়ফড় করে সে উঠে বসে দাওয়ার ওপর। অনেক কথা মনে পড়ে যায়। মৃত স্বামীর কথা, নিজের কথা, জংলীর কথা, সৈন্যদের কথা! খণ্ড খণ্ড অধ্যায়। ফসল-ঝরা নগ্ন মাঠের রিক্ততা যেন তাকে মুলো বাড়িয়ে ডাকে ওপার থেকে।

ভরা আশ্বিন।

মরা মানুষদের হাড়ের সার পেয়ে সবুজের ঢল নামে মাঠে মাঠে। দিগন্তবিসারী কাঁচা সবুজের বন্যায় ক্ষতস্থানগুলো ভরে ওঠে তাড়াতাড়ি। আবহাওয়ায় রং লাগে নতুন। হলুদ···হাল্কা হলুদ রং।

ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা পঞ্চাননের দোকানে এসে থামে জংলীর মা। পয়সা দিয়ে দু খিলি পান কেনে। খয়েরি রঙে ভিজিয়ে নেয় তার ঠোঁট দুটো। হেসে দুটো মস্করা করে। নাচের ভঙ্গীতে চাবুকের মত কোমরটা ঘুরিয়ে দেখে একবার। তার পর এক পলকে অদৃশ্য হয়ে যায়। স্টিমার-ঘাটের দোকানগুলোতে ডে লাইট জ্বলতে দেখা যায়। হাজার জোনাকির আলো দিন করে রেখেছে রাতকে।

মাঝে মাঝে পাত্তা পাওয়া যায় না জংলীর। রাত রাত ঘরেই ফেরে না। জিজ্ঞেস করলে বলে, দূর গ্রামে গিয়েছিল জরুরী কাজে। বেশী কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পায় না জংলীর মা। কেমন যেন মনে হয় জংলীকে। রাতের দিকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে কেবল বাড়ী আসা, তাও যেন আসতে চায় না জংলী। পরণে খাকি কামিজ, খাকি হাফ প্যাণ্ট। মাথায় সৈন্যদের খাকি টুপি। কাপড় তার গায়ের মাপের চেয়ে অনেক বড়। তবু জংলী গর্বের সঙ্গে এই বেশে সমস্তক্ষণ ঘুরে বেড়ায়। ঘুর ঘুর করে তাঁবুর চারদিকে। সাহেবদের ফরমাস খাটে। চিঠি নিয়ে যায় স্টিমার-ঘাটের ঘাঁটিতে। আবার জবাব লিখিয়ে আনে। সিগ্রেট কিনে আনে দোকান থেকে। এমনি কত টুকিটাকি কাজ। জংলী যেন ফুরসৎ পায় না নিশ্বাস ফেলবার।

সকালে চা টোস্ট বরাদ্দ আছে জংলীর জন্যে। দুপুরের দিকে আধখানা পাউরুটি ও কয়েকটা খোলা মাংসের টিন। কাছের তেঁতুল গাছের নীচে বসে জংলী তার রেশন বের করে। পাউরুটিতে টিনের অবশিষ্ট মাংস

মেখে মুখে পোরে। কী ভালোই না লাগে জংলীর। সত্যিই, এমন খাওয়া তার পূর্বপুরুষও..খায় নি। স্টিমার-ঘাটের হ্যাংলা ছেলেমেয়ে-গুলো এসে ভীড় করে গাছের চারদিকে। জংলীর দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে দেখে। কেউ কেউ কংকালসার হাত বাড়িয়ে দেয়। পঞ্চাননের ঘেয়ো কুকুরটা পর্যন্ত লেজ নাড়তে নাড়তে আসে। কোনো কোনো দিন জংলীর অলক্ষ্যে মাংসশুদ্ধ টিন দাঁতে চেপে দৌড় দেয়। নাগাল পাওয়া যায় না তার।

মাঝে মাঝে ছেলের কথা ভেবে দুঃখ হয় জংলীর মার। কেমন যেন হয়ে গেছে তার ছেলেটা। নেশা করে, সিগ্রেট খায়, ঘাটের বখাটে ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা মারে। আজকাল আর মোট তুলতে যায় না স্টিমার এলে। অথচ ছেলের পকেটে প্রায়ই টাকা পয়সা দেখতে পায় জংলীর মা। জিজ্ঞেস করলে বলে, সাহেবরা দিয়েছে। অত কাজকর্ম করে দি, মাঙনা নাকি ও সব।

সত্যিই তো। দিতেই পারে সাহেবরা পয়সা। সারাটা দিন তো জংলী সেখানেই থাকে। সাহেবদের কাজকর্ম করে, জুতোয় কালি দেয়। আরও কত কি করে, সবই কী জানে জংলীর মা।

তবু কখনও কখনও মাঝ রাতে ঘরে ফিরলে ছেলেকে প্রশ্ন করে জংলীর মা। বলে—না ফিরলেই পারিস এত রাত করে ঘরে! একটু তাড়াতাড়ি ফিরলে কী ক্ষেতিটা হয় শুনি?

আর কত তাড়াতাড়ি ফিরবো? এই তো ফিরছি কাজ সেরে। সহজ কথায় উত্তর দেয় জংলী। তিন বেলা করে খেতে দেয় পেট ভরে। ও কী মাঙনা দেবে বলতে চাও?

তাই বলে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত? অবাক হয়ে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে থাকে জংলীর মা।

হাঁ, রাত পর্যন্ত। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে জংলী।
তাহলে না ফিরলেই পারিস ঘরে দু ঘণ্টার জন্যে ?
ঈস্ কী আমার ঘর! রাগে মুখ ভেংচায় জংলী। ভাঙা কেনেস্তারার চালা। বর্ষায় জল পড়ে, দুপুরে রোদ আসে। কুকুর বেড়ালও ভালো থাকে এর চেয়ে।
হঠাৎ মাথার ওপর চেয়ে দেখে জংলীর মা। টিনের এক পাশে ঝক্ ঝক্ করে এক টুকরো আকাশ। কবে যেন বর্ষায় ক্ষয়ে গেছে টিনের একটা প্রান্ত। সে মেরামত করে উঠতে পারে নি এ পর্যন্ত।
রাগে গজ গজ করতে করতে ঘরের এক কোণে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ে জংলী।
জংলীর মা তবু প্রশ্ন করতে ছাড়ে না। বলে—পঞ্চার কাছে শুনলাম তুই আজকাল বকে গেছিস একেবারে। জহরের মেয়ে আর রতনের ভাইঝিকে তাঁবুতে নিয়ে যাস। গ্রামে গ্রামে মেয়ে সংগ্রহ করে বেড়াস আজকাল। এ সব কী করছিস তুই ?
জবাব দেয় না জংলী। কেবল শুয়ে শুয়ে কাঁদে। শব্দ শোনা যায় তার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদার। এক সময়ে ছেলেকে বুকের কাছে টেনে নেয় জংলী মা। ছেলের কান্নায় জংলীর মার বুক পর্যন্ত ভিজে যায়। ঘামে ভিজে যায় তেলচিটে কাপড়। জংলীর মা তবু ছেলেকে আদর করে, চুমু খায়, বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে। বারো বছর আগে একেই তো সে জন্ম দিয়েছিল তার দেহের অণু পরমাণু এক করে।

একদিন সন্ধের সময়ে পঞ্চাননের দোকান থেকে পান খেয়ে বেরোতে যাবে জংলীর মা, এমনি সময়ে হৈ চৈ ওঠে চায়ের দোকানের সামনে।

মনে হয় জংলীকে কে যেন মারছে। পঞ্চানন ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বলে—যাও, যাও। কীর্তি দেখোগে তোমার ছেলের। আবার দেখ কার মেয়ের সর্বনাশ করল ?

জংলীর মা কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দূর থেকে ব্যাপারটা ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করে। ভীড়ের মধ্যে একটা বুড়ো মত রোগা লোক চিৎকার করে বলছে—কাণ্ড দেখ হারামজাদা ছোঁড়ার। কাল রাতে ফিরতে পারি নি। গগ্‌নার না-য়ে ওপারে গিছলাম একটু। ওমনি এই ফাঁকে আমার কচি মেয়েটার সর্বনাশ করেছে এই হতভাগা ছেলেটা। খচ্চর, শুয়োর কোথাকার। লোকটা জংলীর কাঁধে ঝাঁকুনি মেরে পর পর কয়েকটা চড় মারে যেখানে সেখানে।

চায়ের দোকান ফেলে মাখন সিকদার বেরিয়ে আসে বাইরে। জিজ্ঞেস করে—থামো থামো, কী হইছিল আগে তা পরিস্কার করে বল।

লোকটা প্রথমে হাউ মাউ করে কাঁদে নিজের মনে। তার পর মাখনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে তার সর্বনাশের কাহিনী বলে। গত রাতে দুজন সৈন্যকে তার ঘরে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল জংলী। ঘরে একলা ছিল তার মেয়ে। চারদিকে কোনো বসতিও নেই যে ডাক শুনে ছুটে আসবে। এখনও পর্যন্ত তার মেয়েটা বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে ভয়ে।

হায় হায় আমার কি সর্বনাশ হয়ে গেল বাবু! বুড়ো রাগে মাথার চুল ছেঁড়ে। আমার সারা মুখে চুণ কালি লেপে দিয়েছে হারামজাদা ছেলেটা। পাশের লোকগুলো বুড়োর কথা কিছু কিছু বুঝতে পেরে সহানুভূতি জানায়। অবাক হওয়ার চেষ্টা করে। মাখন সিকদার দোকান থেকে একটা সরু লাঠি বের করে এনে জংলীকে মারে এলোপাতাড়ী।

আরো কয়েক ঘা দাও ভালো করে। শিক্ষে হোক ছেলেটার। একজন বলে।

আর হয়েছে শিক্ষে! এই বয়সে যখন মাথা বিগড়েছে তখন উচ্ছন্নে যাবে শেষ পর্যন্ত। দ্বিতীয় লোক উত্তর দেয়।

উচ্ছন্নে যাবার বাকী আছে আর কিছু? ঐ পল্টনগুলো এসেই মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে ছোঁড়াটার।

অমন মা থাকতে পল্টন দরকার হয় না মাথা ঘোরাবার জন্যে। নিজে খারাপ পথে গেছে, ছোঁড়াটাকেও নিয়ে গেছে সঙ্গে করে। চতুর্থ লোক কথা বলে।

জংলী কাঁদে না। মার খেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে গম্ভীর মুখে। তার খাকি টুপিটা ধুলোয় পড়ে।

মাখন সিকদার শাসায়—ফের যদি এ কাজ করবি তো এই লাঠি দিয়ে মাথা ভেঙে দু ফাঁক করে দেব। তার পর ভাসিয়ে দেব নদীর জলে।

জংলী মাখনের দিকে তাকায় চোখ বড় বড় করে।

কয়েকদিন পঞ্চাননের দোকানে পান নিতে আসে না জংলীর মা। পঞ্চানন বুঝে উঠতে পারে না—কী হল? এ পথ দিয়েই জংলীর মা প্রতিদিন তাঁবুর দিকে যায়। যাবার পথে পান খেয়ে যায় তার দোকানে। চোখ দুটো ঘোরালো করে তার দিকে দৃষ্টি হেনে যায় একবার—যেন কী ইশারা করে যায়, মনে করিয়ে দিয়ে যায় পুরোনো কথা। পঞ্চানন বুঝেও বোঝে না। হয়ত অসুখ বিসুখ করেছে জংলীর মার, পঞ্চানন ভাবে। কিংবা হয়ত এ পথ দিয়ে যায় না। লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে অন্য পথ দিয়ে যায়। আবার হয়ত এ সব কিছুই নয়। সে

হয়ত নতুন করে ঘর বাঁধবার চেষ্টায় আছে। ছেড়ে দিয়েছে অসম্মানের পথ। পয়সাও জমেছে কিছু হাতে।

একদিন রাতের দিকে চুপি চুপি পেছনের খোলা দরজা দিয়ে জংলীর মা পঞ্চাননের ঘরে এসে ঢোকে। অস্পষ্ট আলোয় তাকে দেখতে পেয়ে পঞ্চানন লাফিয়ে ওঠে বিছানা ছেড়ে। বলে—এত রাতে আমার কাছে কী কাজ পড়লো জংলীর মা?

কাজ কিসের? এমনি এলাম তোমায় দেখতে।

দেখতে! পঞ্চানন দাঁত বের করে হাসে হি হি করে। তাই বলে এত রাত করে আসতে হয়?

অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকে জংলীর মা।

তা, এসেছ যখন বসে যাও একটু। পঞ্চানন বিছানার প্রান্ত দেখিয়ে দেয়।

জংলীর মার কাপড় দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় পঞ্চানন। এ বেশে তাকে অনেক দিন দেখা যায় নি। ছেঁড়া একটা তেলচিটে কাপড়। তাও খাটো করে পরা। কি রকম একটা আঁশটে গন্ধ সারা কাপড়টায়।

তা, এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলে না কি তাঁবুর দিকে? জিজ্ঞেস করে পঞ্চানন।

না ছেড়ে দিয়েছি সেখানে যাওয়া।

ক দিন টিকবে এ পণ? খাবার না থাকলে আবার তো যাবে সেখানে।

না, নতুন সংসার পাতবো এবার। জংলীর মা উৎসাহ নিয়ে বলে। ভাঙা চালাটা মেরামত করিয়ে নেব টিন দিয়ে।

ও, তা কাকে নিয়ে সংসার পাতবে ঠিক করেছ? পঞ্চানন প্রশ্ন করে। তোমাকে।

আমাকে? পঞ্চানন প্রস্তাবটা য়েন ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেয়। তোমায় নিয়ে ঘর করবার সাধ আমার মিটে গেছে জংলীর মা।

একদিন তুমিই তো পায়ে ধরে সেধেছিলে। জংলীর মা মরিয়া হয়ে বলে।

সেদিনকার কথা ভুলে যাও। আজ আর তোমায় নিয়ে ঘর বাঁধা চলে না।

জংলীর মা উদাস হয়ে বসে থাকে। নিজের মনকে হাজার রকম প্রশ্ন করে। স্বভাব চরিত্তির কী শুধু তার একলারই খারাপ হয়েছে?

পঞ্চানন উত্তর না পেয়ে নিজেই কথা বলে—সে দিন তো'বড় জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেছলে সটান্। আজ বাড়ী বয়ে তার প্রায়শ্চিত্তি কর্তে এসেছ।

না, ভেবে দেখলাম এবার বিয়ে করে ঘর বাঁধবো একটা। জংলীটাও কেমন যেন বকে যাচ্ছে দিন দিন। তাকেও বেঁধে রাখবো ঘরে।

বেঁধে রাখবে? বাঁধা থাকবার ছেলে কি না জংলী! পঞ্চানন শব্দ করে খানিকটা হাসে। তা ভালো, বেঁধে রাখো যাকে পারো। চেষ্টা করে দেখো যদি কানন সিকদারকেও বাঁধতে পারো বেড় দিয়ে।

শ্লেষটা বুঝতে পারে জংলীর মা। একদিন মাখনের ভাই কানন সিকদারের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হেসে দুটো কথা বলেছিল সে, সেই থেকে পঞ্চানন মাঝে মাঝে তাকে সেই কথা শোনায়। কাননের এক চোখে ছানি, মুখে ধবলের দাগ, হাতের একটা কড়ে আঙুল নেই।

মোলায়েম হয়ে উত্তর দেয় জংলীর মা—তুমি থাকতে কাননকে বেড় দিতে যাবো কোন্ দুঃখে? ও কী আমার কাছের লোক?

কথা শুনে পঞ্চাননের দয়া হয় জংলীর মার ওপর। বেচারী অনেকটা আশা করে এসেছে তার কাছে। তাই আশ্বাস দেবার ভঙ্গীতে পঞ্চানন

বলে—আচ্ছা, এখন যাও। পরে ভেবে দেখবো তোমার কথা। কিন্তু এর মধ্যে তোমার ফুটো ঘরটা ঝালিয়ে রাখো। গোবর দিয়ে নিকিয়ে রাখো ভাঙা উঠোনটা। ঘরের পাশ দিয়ে যেতে কেমন যেন ভয়ে টিপ্ টিপ্ করে বুকখানা।

পঞ্চাননের কথায় উঠে দাঁড়ায় জংলীর মা। তার সর্বাঙ্গে কেমন যেন একটা নিস্প্রাণ সবলতা এসেছে। শরীরের সমস্ত খাঁজগুলো ঢাকা পড়ে গিয়েছে একে একে।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে জংলীর মা নিষ্প্রভ গলায় বলে—বেশ, ভেবে দেখো পরে। নইলে কানন রইল, তাকে বলে দেখব একবার!

জংলীর মা তেরছা চোখে কটাক্ষ হেনে যায় পঞ্চাননকে।

ঘরের ঘুলঘুলি থেকে মুখ বাড়িয়ে পঞ্চানন দেখে একটা ছায়ামূর্তি শিখার মতন এগিয়ে চলেছে তাঁবুর দিকে। একদিকে নদীর জল অন্য দিকে সৈন্যদের তাঁবু। শান্ত্রীরা এখনই হয়ত শেষ বিউগল্ দেবে যুদ্ধের জানানি দিয়ে।

শহরটা দু ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে প্রকাণ্ড রেল লাইন। একদিকে স্টেশন, ডাকঘর, আদালত, থানা, ডাক-বাংলো, জেলখানা, দোকানঘর, হাট বাজার যাবতীয় সমস্ত কিছু। তার ওপর মানুষের বসতি, খোলার ঘর, চাষের ক্ষেত আর দিগন্ত-প্রসারিত শালের জঙ্গল। সরু সরু আকাশমুখী গাছগুলো যেন সবুজ করে রেখেছে আকাশটাকে। অন্য দিকে শ্রীধর কলোনি, তার বড় বড় বাড়ী···আধুনিক ঢংয়ের আঁকাবাঁকা ইমারৎ। এক কথায় শহরটা ফেঁপে উঠেছে, গেঁজে উঠেছে এক অস্বাভাবিক স্ফীতিতে। গ্রীষ্মের সময়ে তেতে ওঠে সমস্ত শহরটা। কাল বৈশাখীর ঝড়ে রাস্তার লাল ধুলো পাক খেয়ে খেয়ে আকাশ পর্যন্ত গিয়ে পৌছয়। দুপুরের দিকে দরজা জানলা বন্ধ দেখলে বোঝা যায় সারা উপনিবেশটা হাত পা ছড়িয়ে আরাম করছে। কোনো কোনো বাড়ী থেকে ফিল্মের রেকর্ড শুনতে পাওয়া যায়—"হৃদয় আমার হল স্বয়ংবরা।" বোঝা যায় কারা বাজাচ্ছে। বেঁচে থাক বাংলা ফিল্ম!

লাল মাটির রাস্তায় দেখা যায় ছাতি মাথায় মাথন সামন্তের মেয়ে শ্রীধর কলোনির সীমান্ত পেরিয়ে স্টেশনের দিকে চলেছে। পেছনে ধুলোর নগণ্য ঘূর্ণি। এও বোঝা যায়। ট্রেনের সময় হয়েছে। মফঃস্বল শহরে স্টেশনে বেরিয়েও আরাম আছে। এটা সাবিত্রীর একটা সখ। স্টেশনে অনেকের দেখা পাওয়া যায়। তাছাড়া গ্রীষ্মের ছুটিতে ছেলেরা বাড়ী এসেছে। ট্রেনের সময়ে তাঁরা প্লাটফর্মে কিংবা ওয়েটিং রুমে রীতিমত গুলজার করে। সাবিত্রী তাদের কাছ দিয়ে সময়ে সময়ে টহল দিয়ে যায় কিংবা ওয়েটিং রুমে বসে মাসিকপত্র পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে একশো জোড়া চোখ হুমড়ি খেয়ে পড়ে সাবিত্রীর ওপর। নানান রকম মন্তব্যের ঝড় ওঠে তাকে কেন্দ্র করে। সাবিত্রী সেগুলো উপভোগ না করে পারে না। এটা তার মনের খোরাক যা তাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে একটা বিচিত্র সমৃদ্ধি দান করেছে। সাবিত্রী প্রতিদিন নতুন করে বেঁচে ওঠে, বলীয়ান হয়ে ওঠে এরই রস সঞ্চয় করে।

শীতকালে হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডায় সমস্ত শহরটা যেন শীর্ণ হয়ে যায়। বাড়ীর পরদা তুলে দেয়া জানলাগুলোতে রোদ এসে উঁকি মারে। বিবর্ণ মানুষগুলো আলোয়ান জড়িয়ে বাগানে এসে রোদ পোয়ায়। বাপ্‌স এত শীতও পড়ে! শালবন থেকে কুণ্ডলী পাকানো হাওয়ার সিরিঞ্জ এসে ছুঁচ ফুটিয়ে দিয়ে যায় মাঝে মাঝে। পুলকেশ বক্সীর বাড়ীতে রেকর্ড বাজতে শোনা যায়—"আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান।" গিরিজা চক্রবর্তীর বুড়ী মা পান চিবুতে চিবুতে গাল পাড়ে—মুখপুড়ী মেয়েগুলোর আর খেয়ে বসে কাজ নেই। সকাল হতে না হতেই মড়া পোড়ানো গানের পালা দিয়েছে। মেয়েগুলো যা সব তৈরী হচ্ছে আজকাল। এ দিকে নগেন হাজরার মেয়েরা পাল্লা দিয়ে রেকর্ড বাজায়—"চোখে চোখে রাখি হায়রে।" শীতের সকালে গানের প্রতিযোগিতা চলে।

পুরোনো হলে কি হবে? তাদের কাছে গানগুলোর গুরুত্ব এতটুকু লাঘব হয় নি। শ্রীধর কলোনির সামনের মাঠে দেখা যায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ব্যাডমিণ্টন খেলছে। তাদের মধ্যে সাবিত্রীকে অনায়াসেই চেনা যায়। ছোটদের মধ্যে সে নিজেকে অকায়ক্লেশে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। শাড়ীটাকে বেশ আঁট করে বেঁধে নিয়েছে কোমরে। বুকের উপর একতাল কাপড় ফেঁপে উঠেছে তুলোর মতন। মাফ্‌লারটা কয়েক পাক জড়িয়ে নিয়েছে গলার ওপর। কালো রং। তার ওপর সোনার চশমা—আঁটসাট শরীরের গড়ন। শীতকালের কাঁচা রোদে সাবিত্রীকে অদ্ভুত মানিয়েছে। হারজিতটা তার কাছে গৌণ। ইচ্ছে করেই সে ছোট ছেলেমেয়েদেরকে জিতিয়ে দিচ্ছে। খেলতে খেলতে মাঝে মাঝে আড় চোখে মাঠের কয়েক গজ দূরের ভীড়টার দিকে দেখে নিচ্ছে গভীরভাবে। উপনিবেশের বাসিন্দাদের বয়স্ক ছেলেরা এসে ভীড় করেছে মাঠের ধারে। শীতের সকালের অলস সময় কাটাবার পক্ষে দৃশ্যটা কম উপভোগ্য নয়। সাবিত্রী সময় সময় তার বুকের কাপড়টাকে আরও ফাঁপিয়ে দিচ্ছে পালকের মতন।

বর্ষাকালে জীবনযাত্রা একটু অন্য পথ ধরে এগোয়। লাল মাটির রাস্তায় কাদা ওঠে এক হাঁটু। সারাক্ষণ টিপটিপে বৃষ্টি। সকাল দুপুর সন্ধে, চেনা যায় না কোন্‌টা কী? বাজার যেতে কারো মন ওঠে না। দোরগোড়ায় সাঁওতালীদের কাছ থেকে তরি-তরকারি পাওয়া যায়—এমন কী মাছ পর্যন্ত। মাংসভূকদেরও বাজারে যাওয়ার প্রয়োজন করে না। বসির মিঞা বাড়ী বাড়ী ফিরি করে মাংস দিয়ে যায়। কলোনির জীবনে যেন সাময়িক ভাটা পড়ে। শালবন থেকে একটা বিচিত্র সোঁদা গন্ধ আকাশকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। বোঝা যায় বর্ষা এসেছে। জটায়ুর মত কালো মেঘগুলো আকাশের দিকে দিকে বর্ষায় অস্ত্র

শানিয়ে বেড়ায়। পাল্লা দিয়ে রেকর্ড বাজে—'এমন দিনে তারে বলা যায়'। বিঘিয়ে-ওঠা জীবনে হিংস্র পরিহাস সাপের মতন নড়ে চড়ে বেড়ায়। সাবিত্রী অবিশ্যি প্রায়ই বেরোয়। হেঁটে নয়, সাইকেল রিক্সা করে। বাড়ীর খোলা জানলা দিয়ে কয়েক জোড়া চোখ উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে দেখে রাস্তার দিকে। কাদা ভেঙে রিক্সাওয়ালা কোনো মতে পথ করে চলেছে বীর বিক্রমে। সাবিত্রীর হাতে খবরের কাগজ কিংবা মাসিকপত্র।

সাবিত্রী যেন এই শহরের প্রাণ। মাটির শহরটাকে সে যেন জিইয়ে রেখেছে তার জীবনীশক্তি দিয়ে। নইলে কবে নিবে যেত—ফ্যাকাশে হয়ে যেত এখানকার আকর্ষণ। সে হয়ত জানে না তার আসার পর থেকেই এখানকার মানুষদের জীবনে একটা বিপ্লব এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনেও এসেছে প্রকাণ্ড রূপান্তর।

কুৎসার কালো ধোঁয়া এসে জমা হয়েছে সাবিত্রীর জীবনের ওপর। শহরের অধিকাংশ মানুষ তাকে ঘৃণা করে। হয়ত তার কারণও আছে। কিন্তু কারণ নিয়ে সাবিত্রীর দরকার করে না। সে শিখার মতন জ্বলছে আর সেই শিখাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে শহরের মানুষ।

সাবিত্রীর জীবনের পেছনে কিন্তু বিচিত্র ইতিহাস। সে অনেক দিনের কথা যে দিন মাখন সামন্ত সাবিত্রীর মাকে নিয়ে এই শহরে পালিয়ে এল। না পালিয়ে উপায়ও ছিল না। পরস্ত্রীকে নিয়ে পরিচিত গণ্ডির মধ্যে বাস করা সম্ভবপর নয়। মাখন এসে আশ্রয় নিল এখানে। তিন টাকা দিয়ে ভাড়া নিল খোলার ঘর। সাবিত্রীর বয়স তখন এক বছর। দারিদ্র, অনাহার, অবহেলাকে মাথায় করে মাখন সোজা হয়ে

দাঁড়াবার চেষ্টা করল। অর্থের চিন্তা নিয়েই যত অনর্থ। মাখন কলেজের বিদ্যা কিছুটা গলাধঃকরণ করে নি তা নয়। অর্থের বাজারে কিন্তু বিদ্যাটা গৌণ। গ্রীষ্মের চার মাস মাখন আদালতে পাখা টানবার কাজ পেল। কিন্তু তাতে পেট ভরে না। বিকেলের দিকে বাড়ী বাড়ী পাউরুটি বিস্কুট ফিরি করে টাকার উপায় হল। মাখনের জীবন থেকে উবে গেল প্রেম। জীবিকা প্রকাণ্ড হয়ে দেখা দিল তার জীবনে। তার আরেকটা ভয় ছিল সাবিত্রীর মাকে নিয়ে। পুলিশ, আদালত, নারীহরণ মামলা। কিন্তু কিছুই হয় নি। মাখন ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করল লোক সমাজের কাছে।

চরমতম দারিদ্রের মধ্যে দিয়ে কেটেছে সাবিত্রীর শৈশব। তার পর খোলার ঘর ছেড়ে উঠে এসেছে টিনের চালায়······টিনের চালা ছেড়ে পাকা বাড়ীতে। তার পর শ্রীধর কলোনিতে নিজেদের পয়সায় তৈরী বাড়ীতে। দিন দিন মাখন আর্থিক সমৃদ্ধিতে ফেঁপে উঠেছে। জীবনের কোনো অর্থোপার্জনের পথই সে বাকী রাখে নি। মণিহারী দোকান করেছে, ইটের পাঁজা পুড়িয়েছে, কুলি খাটিয়েছে, ধান চালান দিয়েছে শহরে, নীলামে উঁচু ডাক দিয়ে শালবন কিনেছে। আরও অনেক কিছু। তার পর যেদিন নিজের জড়ো করা পয়সায় শ্রীধর কলোনির দেড় বিঘে জমির ওপর তার ইটের ইমারৎ মাথা তুলে দাঁড়ালো সেদিন মাখন সামন্ত নতুন মানুষ। ষোল বছর আগেকার আদালতের পাখা-কুলির ভগ্নাবশেষও সেদিন তার মধ্যে বেঁচে নেই। সাবিত্রীও তখন স্থানীয় হাই স্কুলের দরজা দিয়ে শেষ পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে নতুন দীপ্তিতে।

সাবিত্রী চলে গেল কলকাতায়। হোস্টেলে থেকে কলেজে পড়বে। মাখন আর সরমা দুজনেরই তাই ইচ্ছে। সামাজিক প্রতিষ্ঠার

বিস্ফারের মুখে তারা দাঁড়িয়েছে। স্বর্ণের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাদের আকাশ।

মাখনের আর্থিক বিস্ফারের দিকে তাকিয়ে সকলের চোখ টাটায়। পুরোনো দিনের কথা সকলের মনে আছে। আদালতের পাখা টানা, রাস্তায় রাস্তায় পাঁউরুটি বিস্কুট ফিরি করে বেড়ানো—এগুলো সহজে ভুলে যাবার মতন নয়। তার পর তিন টাকা ভাড়ার খোলার ঘরে পরস্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে আসা। মাখনের অতীত মানুষের পাকস্থলিতে এখনও গিজ্‌গিজ্‌ করছে। সমাজের মধ্যে মাখনের কোনো সম্মান নেই। সে অস্পৃশ্য।

তার পুঁজি বলতে এখন কিছু নেই। অনেক কষ্টে যে কটা টাকা সে জড়ো করেছিল তা বাড়ী তুলতেই ফুরিয়ে গেছে। বরং বাজারে দেনা হয়েছে কিছু। সেগুলো শোধ দিতে হবে তা নিয়েই মাখনের যত রাজ্যের চিন্তা। একে একে সরমার গায়ের গয়নাগুলো বিক্রি হয়। বাইরে থেকে মনে হয় প্রকাণ্ড মহীরুহ কিন্তু ভেতরটা বাঁশের মতন ফাঁপা। মাখনের কাজকর্মে যা আয় হয় তাই দিয়ে কোনো মতে সংসারের খরচ চলে। মাসে মাসে সাবিত্রীর জন্যে মনিঅর্ডার করে টাকা পাঠান হয়। সময় মত পাঠাতে পারলে মাখন হাঁপ ছেড়ে বেঁচে যায়। কলেজ আর হোস্টেলের মোটা খরচ জোগাবার মতন তার সামর্থ কোথায়? তাছাড়া শুধু সাবিত্রীই নয়। মাখনের তিনটি ছেলেমেয়ে আছে। তাদের মানুষ করার খরচ জোগাতে জোগাতে সে পাগল হয়ে যাবে হয়ত। মাখন আয় বৃদ্ধির জন্যে হাতীর মতন খাটে। সকাল থেকে সন্ধে। কিন্তু মন থেকে প্রেরণা পায় না। প্রেম, অর্থ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, বিলাস—! মেঘের মতন আকাশে মিলিয়ে গেছে তার অতীত দিনের স্বপ্ন। সরমারই বা সেই রঙিন আকর্ষণ কই! রাতের অন্ধকারে মাঝে মাঝে

সে সরমার নিশ্চেতন লোমশ দেহকে দূরে সরিয়ে দেয়। বিস্বাদ লাগে সরমাকে। তার প্রাণহীন আত্মসমর্পণ বিষিয়ে তোলে তাকে। সরমার কাছে সে শুধু দেহই চায় নি।

তবু অন্য সকল মানুষের মতনই মাখন বেঁচে আছে। রেল লাইনের ধারে তার 'সাবিত্রী হোটেল' মন্দ চলে না। ছয় বছর হয়ে গেল। এক রকম দাঁড়িয়ে গেছে বললে চলে। দূরের গ্রাম থেকে বহু লোক আদালতে আসে। দুপুরের দিকে 'সাবিত্রী হোটেলেই' বেশীর ভাগ লোক যায়। কারণ খাওয়াটা ভালো। তাছাড়া নানান্ জাতের ব্যবসায়ীরা প্রতিদিন শহরে আসছে যাচ্ছে। তারা এখানকার একরকম বাঁধা খদ্দের। এমন কী মাখন সামন্তের হোটেলে কয়েকজন স্থায়ী বোর্ডার পর্যন্ত আছে। তারা সেখানে থেকে কলকাতায় শাল পাতা, শাল কাঠ, কয়লা, ধানচাল সমস্ত চালান দেয়। মাখনের আয়ের মোটা অংশটা আসে এই হোটেল থেকেই।

'সাবিত্রী হোটেলের' বাড়ীটা একেবারে কাঁচা মাটি দিয়ে তৈরী। এঁকেবেঁকে দোতলা অবধি উঠেছে। বর্ষাকালে দেয়াল ধসে পড়ে মাঝে মাঝে। আবার জোড়াতালি দিয়ে বাড়ীটাকে যতটা সম্ভব ভদ্র রূপ দেয়া হয়। বৈশাখের ঝড়ে কখন কখনও টিনের চাল আকাশে উড়াল দেয়। ওপরের অন্ধকার ঘরগুলোতে গ্রীষ্মের চড়া রোদ ঝলমল করে ওঠে। কিন্তু তাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। যারা থাকবার তারা থাকে। মশার কামড়, দড়ির খাটিয়ার ছারপোকার অত্যাচার, মাটির ঘরে সাপ আর বিছের দৌরাত্ম্য—এতো লেগেই আছে। তবু লোকেরা আসে, রান্নার গুণকীর্তন করে যায়, দশজনের কাছে 'সাবিত্রী হোটেলে'র প্রচার করে বেড়ায়। মাখন সামন্ত তাতেই খুসী।

সরমা নিজের হাতে সাবিত্রী হোটেল তদারক করে। চাকরদের কাছ

থেকে পাই পয়সার হিসেব নেয়। কড়া নজর রাখে কে কোথা থেকে পয়সা সরালো। বোর্ডারদের কাছে গিয়ে নিজেই তাদের সুখ-সুবিধের কথা জিজ্ঞেস করে। জিনিস পত্তরের দাম হু হু করে বাড়ছে। সরমা মিষ্টি কথায় তাদের চার্জ বাড়িয়ে দেবার কথা বলে। মেয়েমানুষ! কেউ আপত্তি তুলতে সাহস পায় না। সরমা বলে—দেখবেন, এ তো আপনাদেরই হোটেল। আপনাদের সহানুভূতি পেলে আরো ভালোভাবে চলবে।

সবাই জানে—গত ছ বছর থেকে সাবিত্রী হোটেলের কিন্তু একই অবস্থা। মশার কামড়, ছারপোকার অত্যাচার, বিছে আর সাপের দৌরাত্ম্য! তবু অন্য হোটেলের তুলনায় ভালো। তাই লোকেরা নিজেদের গরজেই আসে। মোটা চালের ভাত, অড়হর ডাল আর কুমড়োর তরকারী খেয়েও রান্নার তারিফ করে যায়।

মাখনের কোনো পরিবর্তন নেই। হাতে বাজারের পুরোনো থলি। মাথার চুল এলোমেলো। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মুখে নির্বিকার দৃষ্টি। এমনি ভাবেই মাখন সারা শহর টহল দিয়ে বেড়ায়—ভ্রুক্ষেপহীন। তার জীবনে টাকার মূল্য বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলো দমকা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে শূন্যে। মাখন তবু সংগ্রাম করে চলেছে অন্তসারশূন্য আদর্শের পথ ধরে। বাঁচতে হবে তাকে, বাঁচাতে হবে তার পরিবারকে। সাবিত্রী হোটেলের সামনে দিয়ে রেল গাড়ী যেতে যেতে বাড়ীর ভিত পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়ে যায়। বাসনগুলো ঝন্‌ঝন্ করে কেঁপে ওঠে একসঙ্গে। মাখন ভাবে, বাড়ীটা একদিন হয়ত সবশুদ্ধ হুড়মুড়িয়ে পড়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে চাপা দিয়ে যাবে তার জীবনের আশা আকাংখাকে।

রাতের দিকে মাঝে মাঝে মাখনের সামনের ঘরে আড্ডা জমে। সস্তা

মদের ফেনায় গেলাস উপচে ওঠে। কোনো কোনো দিন নেশার মধ্যে মাতলামি-চলে বেপরোয়া। শ্রীধর কলোনির দূরের বাড়ীগুলো জেগে ওঠে হৈ চৈ শুনে। আবার শেয়ালের ডাকে সমস্ত চাপা পড়ে যায়।
আই এ পরীক্ষা দিয়ে সাবিত্রী ফিরে আসে নতুন মানুষ হয়ে। মাখনের আর কলেজের ফী জোগাবার সামর্থ নেই। সুতরাং সাবিত্রী স্থির হয়ে শ্রীধর কলোনির বাড়ীতে স্থায়ী হয়ে বসে। পড়াশোনার ল্যাঠা চুকে গেছে তার। এবার তার জীবনের মহীরুহে পল্লবিত হয়ে ওঠবার সময়। চলবার পথে সে যেন স্রোত অনুভব করে। মনে হয় নিস্প্রাণ উপনিবেশ যেন আবার প্রাণশক্তিতে জেগে উঠেছে। হাতের মুঠোয় অফুরন্ত সময়। সাবিত্রী কারণে অকারণে শহরে টহল দিয়ে বেড়ায়। পাড়ি জমায় স্টেশনে। ব্যাডমিণ্টন খেলে, ভোর হতে না হতেই ডাক-ঘরের জানলায় উঁকি মারে যদি সকালের ডাকে কোনো চিঠি এসে থাকে। বন্ধুদের নিয়ে বাজারে যায়—দর করে এটা সেটা। মাখন সামন্তের নতুন মাংসের দোকানে খোঁজ খবর নেয়—কী রকম বিক্রী হচ্ছে। সাবিত্রী মার সঙ্গে মাঝে মাঝে হোটেলে তদারক করতে যায়। রান্নাঘরে ঠাকুরকে সাহায্য করে তরকারি কুটে দিয়ে। লোকদের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে বাক্সে তোলে। সময়ে অসময়ে লোকে চা খেতে আসে। চাকররা ব্যস্ত থাকলে সাবিত্রী নিজের হাতেই চা তৈরী করে দেয়। সবাই হাঁ করে চেয়ে দেখে। আলুর চপ—ছ পয়সা, চা—এক আনা, সাবিত্রী হিসেব করে পয়সা নেয়। দামগুলো তার মুখস্ত হয়ে গেছে। মাখন হিসেব করে দেখেছে, সাবিত্রী আসার পর থেকে তার হোটেলের আয় বৃদ্ধি হয়েছে। সে থাকুক আর না থাকুক, অনেকে সাবিত্রীর দেখা পাবার আশায় চা খেতে আসে। বোর্ডারের সংখ্যাও বাড়ে সঙ্গে সঙ্গে। সাবিত্রী সে বিষয়ে উদাসীন, জলের স্রোতের মত

সে চলে বেড়ায়। একফালি নিশ্চেতন শহর জেগে ওঠে নতুন প্রাণ-স্পন্দনে।

নতুন মুন্সেফ এসেছে শহরে। বরিশালের কোন্ এক জমিদার রাঘব চক্রবর্তীর ছেলে বিরজা চক্রবর্তী। চারদিকে টি টি পড়ে যায়। বিরজার ছেলে পুরন্দর চক্রবর্তী। সাবিত্রীর সঙ্গে আলাপ হতে তার বেশী সময় লাগে না। পথে ঘাটে, ডাকঘরে, স্টেশনের ওয়েটিং রুমে, কোথায় নয়? সাবিত্রী একই সময় যেন মহকুমার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে। পুরন্দরের প্রখর পৌরুষ দেখে সাবিত্রীরই আলাপ করতে ইচ্ছা যায়। ঝক্‌ঝকে খাপ খোলা তলোয়ারের মতন চেহারা। মুখে টানা টানা হাসি। বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পদক্ষেপে দৃপ্ত ভঙ্গী। পুরন্দরের বন্ধু নুরুদ্দিন—তার সঙ্গেও আলাপ হয় সাবিত্রীর। নুরুদ্দিন এস, ডি, ওর ভাগ্‌নে। বাংলা দেশে থেকে বাঙালী হয়ে গেছে। দেখে হিন্দু কি মুসলমান চেনা শক্ত। হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে কথা বলে। হাসিতে গড়িয়ে পড়ে সাবিত্রী। লিপস্টিক মাখা ঠোঁট দাঁতের নীচে চাপবার নিষ্ফল চেষ্টা করে বলে—এত হাসাতেও পারেন আপনি!

পুরন্দর বলে—ও ওমনিই। কয়েক বছর হল বাংলা দেশে আছে। তার আগে ছিল দিল্লীতে। তাই ভালো বাংলা বলতে পারে না।

সাবিত্রী তার নতুন বন্ধুদের বাড়ীতে নিয়ে আসে। শ্রীধর কলোনির বাসিন্দারা হাঁ করে তাকিয়ে দেখে, এ আবার কোন্ নতুন আগন্তুক এল। সাবিত্রী তাদের যত্ন করে ড্রয়িংরুমে বসায়। চা খাওয়ায়। প্রাণ খুলে হাসে। এমন হাসি সে বহুদিন হাসে নি। কল্‌কাতায় তোলা ছবির এ্যালবম্ এনে দেখায় তাদেরকে। ঘরের মধ্যে সাবিত্রীর উপস্থিতি অনুভব

করা যায়। বিদ্যুতের মতন সে চলে বেড়াচ্ছে ঘরের মধ্যে নতুন দীপ্তিতে, প্রখর উজ্জ্বলতায়।

কথায় কথায় পুরুষকেশ বক্সীর মেয়ের কথা ওঠে। তাকে নিয়ে বাজারে নাকি কুৎসা রটেছে। তাই আসছে মাসে জোর করে বিয়ে দেয়া হচ্ছে তার।

পুরন্দর বলে—ভাগ্যবান পুরুষটি নাকি যক্ষ্মা রোগী। কোন্ এক মার্চেণ্ট আপিসে চাকরী করেন।

খুসীতে উপচে ওঠে সাবিত্রী—যাক্ বাঁচা গেছে। মান্ধাতা আমলের রেকর্ড শুনিয়ে শুনিয়ে পচিয়ে মেরেছিল আর কি ?

সাবিত্রীর দেখাদেখি নুরুদ্দিন হাসে। অকারণে বুকের ভেতরকার ফুসফুস দুটো হাপরের মতন ফুলে ওঠে। হাঙরের মতন চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসে সামনের দিকে।

পুরন্দর চিবিয়ে চিবিয়ে বলে—বাঙালী মেয়েদের এই-ই যথেষ্ট। হাজার লেখাপড়া শিখুক, তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়েই আছে।

সাবিত্রী কোথায় যেন চাবুকের জ্বালা অনুভব করে। কয়েক মুহূর্ত চিন্তিত হয়ে বসে থাকে। তার পর বলে—ওসব মেয়ের এমনিই হয়। আস্তে আস্তে মানিয়ে নেবে নিজেকে। যক্ষ্মারোগ, কুষ্ঠরোগ আরও কত কি—ও সবে কিছুই আটকায় না।

এমনি ভাবে প্রায়ই পুরন্দর আসে। কখন কখনও নুরুদ্দিনও সঙ্গে থাকে। মাখনের সঙ্গে তাদের আলাপ হয়েছে। সাবিত্রী নিজেই করিয়ে দিয়েছে। সরমাও তাদের সামনে বেরোয়। কথা বলে। বরিশালের জমিদার রাঘব চক্রবর্তীর নাতি! প্রচুর অর্থের মালিক! সরমা তাদের কাছে মেয়ের রূপের গুণের প্রশংসা করে। পরোক্ষে

আকারে ইঙ্গিতে নানান কথা জানিয়ে দিতে চেষ্টা করে। সাবিত্রী বোঝে, কোথায় যেন সুতো জট পাকিয়ে উঠছে।

ছুটির দিন মাঝে মাঝে পিকনিকে যায় পুরন্দর। সরমাকে এসে জিজ্ঞেস করে সটান—কাল একটু বাইরে যেতে পারবে সাবিত্রী? এই এমনি কয়েক মাইল দূরে আউটিঙে যাবো ভাবছি?
তা যাক না। এমনি বেড়াতে যাবে বইতো না। এতে আমাকে জিজ্ঞেস করার কী আছে? সরমা মিষ্টি হাসি হাসে।
না এমনি বললাম আর কি। এক জায়গায়ে থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছে প্রাণ তাই ঘুরে আসবো একটু। সাবিত্রী গেলে রান্না বান্না করে সাহায্য করবে আমাদের। আপনিও চলুন না মাসিমা। বেড়িয়ে আসবেন আমাদের সঙ্গে। পুরন্দর অন্তরঙ্গতা জানায়।
যাঃ, তাই কি হয়? সরমা উড়িয়ে দেয় কথাটা। হাতের এক গাদা কাজ ফেলে তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাই আর কি? তার চেয়ে তোমরা যাও, ঘুরে এস। মন ভালো হবে।
বাপস্ এত কাজ করতেও পারেন আপনি। আমরা রইছি কেন? আমাদের দিয়ে করিয়ে নিলেই পারেন কিছু কাজ। অভিযোগ জানায় পুরন্দর।
তোমাকে দিয়ে করিয়ে নেব কি? তুমি এমনিতেই করে দিচ্ছ কত কাজ। সরমা চা ঢালে কেটলিতে। সাবিত্রী আসাতে চাপা পড়ে যায় সমস্ত কথা।
পিক্‌নিক্ থেকে ফেরবার সময়ে রাস্তার মোড়ে ছোট্ট অস্টিন গাড়ীটা নামিয়ে দিয়ে যায় সাবিত্রীকে।

সাবিত্রী বলে—তুমি নামবে না ?

না। আজ দেরী হয়ে গেছে অনেক।

আহা, কী এমন দেরী! মা রাগ করবেন কিন্তু না নামলে।

রাগ করবেন! যা নয় তাই বললেই হল ? পুরন্দর চটাবার চেষ্টা করে।

বেশ, না নেমেই দেখ।

কয়েক মুহূর্ত কারো মুখে কথা নেই। শুধু গাড়ীর এঞ্জিনটা শব্দ করে চলেছে একটানা।

এস, বসে রইলে কেন ? সাবিত্রী নিজেই যেচে আবার অনুরোধ করে।

না উঠিয়ে ছাড়বে না দেখছি।

আহা, কি এমন কাজের ক্ষতি হয়ে যাবে শুনি। একটু চা খেয়েই না হয় বাড়ী যাবে। সাবিত্রী চোখ দুটো বড় বড় করে চেয়ে থাকে পুরন্দরের দিকে।

বেশ, তোমার কথাই থাকল। পুরন্দর সুইচ বন্ধ করে নেমে আসে গাড়ী থেকে। একে একে জানলার কাঁচগুলো তুলে দেয় সব কটা। গদির ওপর বাচ্চা আলশেসিয়ানটা মাথা গুঁজে ঘুম দিচ্ছে আরামে।

এ সময়ে রাস্তাটা একেবারে নির্জন। লোকজন চোখে পড়ে না বড় একটা। যেতে যেতে পকেট থেকে একটা খাম বের করে সাবিত্রীর হাতে দেয় পুরন্দর। বলে—তোমার জন্যে নয়। মাসিমাকে দিও খামটা। ভুলে যেও না যেন।

কী আছে এতে ? ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করে সাবিত্রী।

যাই থাক না, তুমি জেনে কী করবে ? পুরন্দর হাসে।

তবু।

যদি বলি টাকা আছে এতে, বিশ্বাস করবে ?

না। সাবিত্রীর গলায় কেমন কাঠিন্ত অনুভব করা যায়।
হো হো করে হেসে ওঠে পুরন্দর। বলে—জানতাম তুমি বিশ্বাস করবে না।
গেট পর্যন্ত সাবিত্রীকে পৌছে দিয়ে পুরন্দর বলে—এখন চলি। কাল আসবো আবার। মাসিমাকে বারণ কোরো রাগ কর্তে।

একদিন সাবিত্রীকে একলা পেয়ে সরমা বলে—ওদের সঙ্গে অত মেলামেশা করছিস তোকে কিছু দিয়েছে নাকি ওরা?
কী আবার দেবে? সাবিত্রীর চোখ দুটো ধারালো হয়ে ওঠে।
বাঃ ওদের সঙ্গে এত প্রাণ খুলে মেলামেশা করছিস, এ সব মাঙনা নাকি? তা হলে অত মাথামাথি করে তোর লাভটা কী? বড়লোকের নাতি। পয়সার ওপর অত মায়া কেন? কিছু পয়সা দিলে ক্ষতিটা কিসের?
পয়সার বদলে নিজেকে বিক্রী করবো বলতে চাও?
আহা নেকী আর কি? সরমা আদর করে বলে। ভদ্দরলোকের বাড়ীতে অমন কত হচ্ছে। আমাদের ঘর সংসার নেই? ছেলেমেয়ে মানুষ করতে হয় না আমাদের?
তাই বলে···সাবিত্রী উত্তেজনায় বাকী কথাগুলো উচ্চারণ করতে পারে না।
হাঁ, বড়লোকের কাছ থেকে পয়সা নিতে আপত্তিটা কোথায়? অমন কত পয়সা ওরা দু হাতে ছড়াচ্ছে তার ঠিকানা আছে?
তাই বলে হাত পাততে যাবো আমরা? সাবিত্রীর ভুরু দুটো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

ওঃ, মর্যাদায় আটকাচ্ছে, না?' হাতে হাত দিয়ে ঘোরবার বেলায় সরমে বাধে না। টাকা চাইতে হলেই মাথা হেঁট·হয়ে যায়! চাবুকের মতন ধারালো সরমার কথাগুলো।

রাগে কোনো কথা বলে না সাবিত্রী। সরমার ইতিহাস তার জানা আছে। চুরি করে দেরাজ থেকে সমস্ত গোপনীয় চিঠিই সাবিত্রী পড়েছে।

সরমা বলে—সাবি, তোর ভাই বোনেদের কথা ভেবে দেখিস। যা আয় হয় তা তো মদেই উড়ে যায়। তার ওপর তোর বাবার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। তুই-ই এখন বাড়ীর ভরসা।

সাবিত্রী দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। নিজের ঘরে এসে বন্ধ করে দেয় দরজা। জানলার বাইরে প্রকাণ্ড শালবন। ঝলমল করছে দুপুরের রোদ। সাবিত্রী জলভরা চোখে তাকিয়ে দেখে দূরে লাল কাঁকরের সড়ক দিয়ে সাঁওতালীরা হাটে যাচ্ছে দলে দলে। কলোনির মাঠে ব্যাডমিণ্টন খেলছে দু চারজন। বাকী উপনিবেশটা ঘুমুচ্ছে আরাম করে। ফুলগুলো তুলে নিয়ে জানলা দিয়ে ফেলে দেয় সাবিত্রী। সমস্ত পাপড়িগুলো শুকিয়ে গেছে গরম হাওয়ায়।

পুরোনো গল্প

কিছুক্ষণ থেমে আবার গল্প বল্‌তে আরম্ভ করল গোরাচাঁদ ঃ

তার পর সন্ধের সময়ে ঘরে ফিরছি হাট থেকে। সঙ্গে ময়নার ছোট ছেলেটা। আধা অন্ধকার, আধা আলো। আকাশ দেখে ভয় হয়। দামাল ছেলের মতন মাতামাতি করছে কালো মেঘ। বাসরে বাস কী ঘনঘটা! এই বুঝি বৃষ্টি ভেঙে পড়ল মাথার ওপর। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ময়নার ছেলেটাকে বললাম—চল্ চল্, এগিয়ে আয় তাড়াতাড়ি। বৃষ্টি নামলে আটক থাকতে হবে গাছতলায়।

ছাতিটা ছেলেটার হাতে দিয়ে হনহনিয়ে এগিয়ে চলেছি ঘর পানে, এমনি সময়ে দেখা ক্ষেতুবাবুর সঙ্গে। উস্কোখুস্কো চুল। চোখে মুখে উত্তেজনার ভাব। আমার পথ আটকে দাঁড়ালেন ক্ষেতুবাবু। বললেন—দাঁড়াও গোরাচাঁদ, তোমার ওখানেই যাচ্ছিলাম খবর দিতে। দেখা হয়ে গিয়ে ভালোই হল। মিটিঙে সমস্ত ব্যাপার সাব্যস্ত হয়ে গেছে আজ। এইমাত্র তার পেলাম একটা।

তাই নাকি? মনে মনে খুসী হয়ে বললাম।

হাঁ, এবার লড়াইয়ের পালা। জান দিয়ে লড়তে হবে কিন্তু।

নিশ্চয়ই লড়বো। আপনারা শুধু হুকুম দিয়ে যাবেন। আমরা কাজ করে যাব সঙ্গে সঙ্গে।

এই তো চাই! পিঠ চাপড়ে ক্ষেতুবাবু বললেন। তোমাদের ওপর ভরসা করেই কাজে নামছি আমরা। আজ রাতের দিকে নটার পর আমার বাড়ীতে যেও তোমরা সব। এ পাড়ার সবাইকে খবর দেয়ার ভার তোমার ওপর। আজকের সভায় ঠিক করা হবে এখানকার কাজকর্ম। যাদের বিশ্বাসী বলে জানো তাদেরই খবর দেবে কিন্তু।

কথাটা শেষ করেই ক্ষেতুবাবু চলে গেলেন। এখনও আমার মনে আছে সমস্ত কথা। খদ্দরের ধুতির ওপর রেশমের ছেঁড়া পাঞ্জাবী। পাঞ্জাবীর বোতাম খোলা। চওড়া বুক। বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল ক্ষেতুবাবুকে।

ঘরে ফিরতে ফিরতে অন্ধকার হয়ে এল। ময়নার ছেলেটাকে ঘরে রেখে আবার বেরিয়ে পড়লাম ছোট দীঘির পথ ধরে। তখন বাজ পড়ছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন। হারাধন, নগেন, কেষ্ট, জুড়ন—সবাইকে খবর দিলাম ডেকে ডেকে। কেউ আসতে রাজী হল, কেউ হল না। কালোর সঙ্গে তো ঝগড়া হয়ে গেল মুখোমুখি। বললাম—বড় যে পিছিয়ে যাচ্ছিস! এমনিতে তো বড় তড়পাস কথায় কথায়। আজ সময় এল, ওমনি ভয় খেয়ে গেলি বেবাক।

কালো জবাব দিল না। বিড়ি টানতে টানতে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

শীতের রাত। ঠাণ্ডায় কনকন করছে সমস্ত শরীর। রামনাথ, বটুক, সতীশ, তারানাথ, বিস্টু, গোরাচাঁদ সবাই গোল হয়ে বসেছে আর মাঝখানে আগুন জ্বলছে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে। মাঝে মাছে ঝলক উঠছে আগুনের। সেই সুযোগে সবাই হাত গরম করে নিচ্ছে আগুনের তাতে। বাপস্, কী শীত পড়েছে এ বছর! কিন্তু গোরাচাঁদের যেন গল্পের শেষ নেই। দু বছর আগের পুরোনো ঘটনা সে বলে চলেছে

একটানা। বরং শীতটা তার বেশী লাগা উচিত। রোগা হাড় বের করা চেহারা, তার ওপর একটা পাতলা কাপড়ও নেই গা ঢাকবার। সময়ে সময়ে দমকা ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে শিমুলের জঙ্গল থেকে। আর হাড় কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ওমনি এক রাশ শুকনো গাছের পাতা তুলে নিয়ে আগুনের ওপর চাপাচ্ছে তারানাথ। সত্যিই মানুষ মারা যাবে এমনি শীতে!

তারানাথ হাসল। বলল—বল বল, থামলে কেন? শীত একটু করবেই। দেখবে গল্প জমতে জমতে আপনা থেকে গরম হয়ে উঠবে হাত পা।

গোরাচাঁদ লজ্জিত হয়ে বলল— না এই বলছি, খানিকটা জিরিয়ে নিলাম আর কি।

ক্ষেতুবাবুর বাড়ী গিয়ে পৌছলাম রাত দশটা আন্দাজ। ঝুপ ঝুপে বৃষ্টি। গায়ের কাপড় ভিজে জব জব করছে। পা টিপে টিপে পেছনকার উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালাম। লোকজন আসতে আরম্ভ করেছে এরিমধ্যে। টিম টিম করে জ্বলছে কেরাসিনের লণ্ঠনটা। কেউ কথা বলছে না। গম্ভীর হয়ে বসে আছে একমনে। নগেন আমাকে দেখে এগিয়ে এল। বলল—এই যে গোরাদা এসে পড়েছো। বস, ক্ষেতুবাবু ভেতরে গেছেন একটু। জেলা কমিটির সুবোধবাবু এসেছেন সন্ধের গাড়ীতে। দরকারী কথা আছে নাকি! রাতের গাড়ীতেই আবার চলে যাবেন আজকে।

সভা বসতে একটু দেরী হল। ক্ষেতুবাবু বেরিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে সেই ভদ্রলোকটি। মাথায় টাক, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখে ধাঁধালো চশমা। লোকজন হয় নি তেমন। একে ঝড় বৃষ্টি, তার ওপর এত রাত। ভয়ও পেয়েছে অনেকে।

গোরাচাঁদ খবর দিয়েছো তো সবাইকে? জিজ্ঞেস করলেন ক্ষেতুবাবু।

যাদের দেবার সবাইকে দিয়েছি। এই দুর্যোগ—সাহস করে বাড়ীর বার হতেই পারে নি বোধহয়।

তা বটে, দুর্যোগ তো আছে। কিন্তু যে ঢেউ আসছে তার মুখে এ দুর্যোগ আর কতটুকু? সমস্ত কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এক তোড়ে। ক্ষেতুবাবু একটু হাসলেন সকলের দিকে চেয়ে।

সভা বসল। সভাপতি হলেন ক্ষেতুবাবু নিজে। প্রথমেই উঠে দাঁড়ালেন সুবোধবাবু। বললেন তাঁর গাড়ীর সময় হয়ে আসছে। কয়েকটা কথা বলেই তিনি চলে যাবেন এখান থেকে। কিন্তু কী অদ্ভুত তাঁর বলার ভঙ্গী। যেন মেঘ ডাকছে আকাশ ভেঙে। না-জানা ভয়ে দুড় দুড় করতে লাগলো বুকখানা। সুবোধবাবু বললেন—ভয় পেও না। মাথা নীচু করো না এক মুহূর্তের জন্যেও। হাজার অত্যাচার আসবে তোমাদের ওপর, তবু জেনো আমরা পেছনে আছি তোমাদের। তোমাদের লক্ষ্য হল—হয় করব নয় মরব।

সব বুঝলাম, কিন্তু কী করতে হবে আমাদের তা খোলসা করে বলুন বাবু। কে একজন শ্রোতাদের মধ্যে থেকে বলল।

সে সমস্ত ক্ষেত্রনাথের কাছেই শুনবে। তাকে বলে গেলাম সমস্ত কিছু। কাজের সময়ে তাকে সব ব্যাপারেই হাতের কাছে পাবে।

তার পর আরেকজন উঠল বক্তৃতা দিতে। চিনি না। কাঁচা বয়স, গোঁফ দাড়ি ওঠে নি তখনও। সেই একই কথা বলল। ঝড় আসছে। ঝড়ের মুখে নৌকো ঠিক রাখতে হবে। পথ হারালে চলবে না। হাল ধরে থাকতে হবে জোর হাতে। তার পর ঝড় কেটে যাবে একদিন। দেখবে ঝলমল করছে নতুন সূর্য। সে সূর্য হবে আমাদের, আর কারো নয়। বন্ধুগণ, এই হল সুবর্ণ সুযোগ। ঘর ছেয়ে নিতে হবে এই বাগে। ওরা আজ কাহিল, দুর্বল। পুবে মার খাচ্ছে, পশ্চিমে মার

খাচ্ছে। যারাই ওদের শত্রু, তারাই বন্ধু আমাদের, একথা ভুলো না কখনও।

তুমুল ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। ছাতি মাথায় দিয়ে একজন ভদ্রলোক ভেতর থেকে এসে বেরিয়ে গেলেন দরজা দিয়ে। বড় বড় দাড়ি। মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত এসে ঠেকেছে। নগেন বলল—অনেকটা সুবোধবাবুর মতন দেখতে না, গোরাদা। চুপ করে রইলাম। কোনো জবাব দিলাম না। নিশ্চয়ই গাড়ীর সময় হয়েছে ভদ্রলোকের।

ক্ষেতুবাবু উঠলেন সবার শেষে। আস্তে আস্তে বললেন আমাদের কি করতে হবে না হবে। শুনে সবাই শিউরে উঠল। প্রলয় আসছে যেন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। আমি নিজে পর্যন্ত থ বনে গেলাম। যেন কিছু নেই চোখের সামনে। ক্ষেতুবাবু বললেন—ভয় পাচ্ছ নাকি তোমরা। কিন্তু এ তো হবেই। এই আত্মত্যাগের বদলে কি পেতে চলেছি চিন্তা করে দেখো একবার। এ সুযোগ আর হয়ত আসবেই না।

সভা ভাঙলো রাত একটায়। ফটক পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন ক্ষেতুবাবু। বললেন—আর হয়ত পরস্পরের মধ্যে দেখাই হবে না। কিন্তু সবাই কাজ করে যেও ঠিক ভাবে। মাঝে মাঝে আমাদের লোক দেখা করবে তোমাদের সঙ্গে। নির্দেশ দিয়ে আসবে কাজের।

ঘরে ফিরে দেখি রাগে টং হয়ে আসছে সৈরিন্ধ্রী। এত রাত করে ঘরে ফিরি না কোনো দিন। কোথায় ছিলাম? কী করছিলাম এতক্ষণ? জবাব দিলাম না সৈরিন্ধ্রীর কোনো কথার। তখন মাথায় ঘুরছে অন্য কথা। ভাবতেই পারছি না কী হবে আসছে কাল? ভূমিকম্পের মতন টলমল করবে সারা দেশটা। কোথায় ভেসে যাবে সৈরিন্ধ্রী, ময়না, তার ঠিক কি?

গোরাচাঁদ থামল। কোথায় থামতে হয় গোরাচাঁদ জানে। কোথায়

থামলে শ্রোতারা ব্যাকুল হয়ে ওঠে বাকীটা শোনবার জন্মে তাও ভালো ভাবে বোঝে গোরাচাঁদ।

বটুক বলল—এই নাও, একটা বিড়ি খাও গোরাচাঁদ। ধোঁয়া না খেলে, জুৎসই লাগে না তেমন।

দাঁড়াও, হাত দুটো তাতিয়ে নিই একটু। গোরাচাঁদ আগুনের ওপব হাত রাখল।

দূরে···জঙ্গলাকীর্ণ চক্রবালের ধার ঘেঁষে চাঁদ উঠেছে এক টুকরো········· বিবর্ণ ফ্যাকাশে। যেন রোগ শয্যা থেকে উঠে এসেছে এইমাত্র। তার হলদে রঙে সারা আকাশটা পর্যন্ত পীতাভ হয়ে উঠেছে সহানুভূতিতে। এধারটা একটু সমতল। কয়েক হাত জমিতে চাষবাস হয় না। কোনো গাছপালাও নেই হাতের কাছাকাছি। তাই এখানে মাঝে মাঝে জটলা বসে, আড্ডা জমে, গল্প গুজব হয় অনেক রাত পর্যন্ত। কোনো কোনো দিন গান বাজনা হয়। ঢোল বাজায় তারানাথ, বিস্টু মুখ দিয়ে আওয়াজ করে অদ্ভুত রকম, গোরাচাঁদের লেখা ছড়ায় সুর দিয়ে গান করে সতীশ। ঘরের দাওয়ায় বসে বসে মেয়েরা গান শোনে উৎকর্ণ হয়ে। আজ তেমনিই বসেছে গল্পের জটলা। দু বছর আগেকার পুরোনো গল্প বলার সখ চেপেছে গোরাচাঁদের।

কয়েক গজের ব্যবধানেই আলুর ক্ষেত। চারাগুলো বড় হয়ে উঠেছে হিম পেয়ে। মাটির নীচে আলু হয়েছে ছোট ছোট·········গোল গোল। ক্ষেতে খস্ খস্ আওয়াজ পেয়েই উঠে দাঁড়াল তারানাথ। বলল—থামো শুয়োর না সজারু নেমেছে মাঠে। বরবাদ করে দিয়ে যাবে আলু। দেখে আসি কি এল আবার। হট্ হট্ কর্তে কর্তে তারানাথ আল বেয়ে নেমে পড়ল মাঠে।

সব দিকে হুঁস আছে কিন্তু তারানাথের।• বটুক বলল। গল্প শুনলে কি হবে—মনটা পড়ে আছে আলুর ওপর।

হবে না? কী মেহনৎটা না করছে দিন রাত। জবাব দিল সতীশ।

সত্যি! দারুণ মেহনৎ করে তারানাথ। ঘাড় নাড়ল বটুক। কাল রাতে সজারু এসে উজোড় করে দিয়ে গেছে একটা কোণ। বেচারী কেঁদে ফেলেছিল অবস্থা দেখে।

তারানাথ দৌড়তে দৌড়তে তার জায়গায়ে এসে বসে পড়ল। বলল—যা ভেবেছিলাম তাই। নষ্ট কর্তে শুরু করেছিল একটা দিক। এই যে, কয়েকটা কাঁটা ফেলে গেছে বড় বড়।

আগুনের ওপর এক রাশ পাতা চাপালো বটুক। পাতার নীচে দিল গাছের শুকনো ডালপালা। শিশির ভেজা পাতায় ধোঁয়া উঠল চোখমুখ ধাঁধিয়ে।

বটুক বলল—গোরাচাঁদ তোমার কথা শুরু কর এবার। রাত অনেক হল মনে হয়।

আয়েস করে গোরাচাঁদ বিড়ি ধরালো। বলল—বলতে ভয় করছে কেমন। অনেক ঝড় ঝঞ্চা দেখেছি, তবু এমনটি দেখি নি কোনো দিন।

তা হোক, বলই না শুনি। বিস্টু বলল।

কয়েকদিন এমনই গেল। কোনো উত্তেজনা নেই যেন। ক্ষেতুবাবু নেই। সদরে গেছেন পরামর্শ নিতে। আর সবাই ভাবছে চুপ করে। কী করবে না করবে। ক্ষেতুবাবু ফিরলেন দু একদিন পরেই। বললেন—শুরু হয়ে গেছে। মিছিল বেরিয়েছিল সদরে, গুলী চলেছে তাদের ওপর। কে যেন বিদ্যুত ছুঁইয়ে গেল। সবাই বলল—টের পাইয়ে দেব এর মজা।

বাইরে কিছু দেখা যাচ্ছে না কিন্তু ভেতরে আগুন জ্বলছে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে।

খবরটা শুনে বিদ্যুতের মতন একটা ঝলক খেলে গেল সকলের রক্তে। মাঠে গেলাম না দুদিন। ফিস ফিসে কথা শুনে ভয় পেল সৈরিন্ধ্রী। পড়ে পড়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। ময়না এসে গলা জড়িয়ে ধরল। মন কিন্তু ঠিক করে ফেলেছি তার আগে।

রাতের দিকে এল জুড়ন। চুপি চুপি, পা টিপে টিপে। কাপড়ের নীচে ঢাকা এক তাড়া কাগজ। বলল—নীতিনবাবু পাঠিয়ে দিলেন এটা। কাল ভোরে তৈরী হয়ে থেকো। অন্ধকার থাকতে বেরুতে হবে কিন্তু।

রাতে ঘুম এল না। বার বার মনে পড়তে লাগলো কাল সকালের কথা। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে ঝুর ঝুর করে। মাঝে মাঝে ভাঙা জানলার ফাঁক দিয়ে দেখছি রাত কত হল। পাশে শুয়ে আছে সৈরিন্ধ্রী। অচেতন হয়ে ঘুমুচ্ছে। এক সময়ে আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে বেরিয়ে গেলাম। ফ্যাকাশে অন্ধকারে জমাট বেঁধে আছে সমস্ত আবহাওয়া। পায়ের নীচে হড়হড়ে কাঁদা। এগিয়ে চললাম কোনো কিছু না ভেবে। দূরে মন্দিরের চারদিকে বেশ লোক জমেছে বলে মনে হল।

যখন ঘরে ফিরলাম তখন সন্ধে। উত্তেজনায় কাঁপছে সমস্ত স্নায়ু। আনন্দ হচ্ছে তার বেশী। লোক মরেছে বারোজন। কিন্তু বন্দুক খালি। আর গুলী নেই একটাও। দারোগাবাবু পালিয়ে গেছে। বাকী যারা তারা কিছু পালিয়েছে, কিছু মাথা হেঁট করেছে ভয়ে। আমাদের লোকেরা আসর জমিয়েছে সেখানে। ক্ষেতুবাবু কিন্তু ধরা পড়েছে তার আগেই। সকালে এসে নিয়ে গেছে তাকে মহকুমায়।

সৈরিন্ধ্রীকে শোনালাম সমস্ত ঘটনা। গুলী ফুরিয়ে গেছে থানায়! বার বার হাসি পাচ্ছিল সে কথা মনে করে। সৈরিন্ধ্রীও দেখলাম হাসছে। ভয় কেটে গেছে তার।

বললাম—আমাদের দেশ, আমরা করব না তো কে করবে?

বক্তৃতা থামাও। সৈরিন্ধ্রী গম্ভীর হয়ে বলল। সকাল থেকে ভাত আগলে বসে আছি তোমার জন্যে। তোমার ক্ষিদে পায় না বলে আর কারো পায় না যেন।

গামছা তুলে নিয়ে নাইতে বেরোলাম। পথে দেখা পেলাম ময়নার। জল নিয়ে ফিরছে কলসী করে।

কয়েকদিন এমনি ভাবে কেটে গেল, টের পেলাম না। আমাদের লোক আসর জমিয়ে বসেছে থানায়। ডাকঘর বন্ধ। সারদাবাবু পালিয়ে গেছে ভয় পেয়ে। লোকজন যেন ছত্রভঙ্গ। পশুপতির দোকানে ঝাপ দেয়া। পশুপতি বাইরে একটা ইটের ওপর বসে গল্প করছে রাস্তা-চলতি লোকের সঙ্গে। ভাঙা ভাঙা হাট বসল। কিন্তু তাও এক ঘণ্টার মধ্যে উঠে গেল। কে যেন খবর নিয়ে এল মহকুমা থেকে গাড়ী ভর্তি ফৌজ আসছে! সবার প্রাণ শুকিয়ে গেল ভয়ে। ফৌজ আসছে। বাপস! ফৌজ আসবে কি?

পা টিপে টিপে বাড়ী ফিরে গেল সবাই। কেউ দৌড়ল, কেউ সোজা পথ ছেড়ে জঙ্গল পার হয়ে ঘরে ফিরল ভয়ে ভয়ে। পথ ঘাট খালি। হাটের ভীড় কোথায় উধাও হয়ে গেল এক নিমিষে। সঙ্গে ছিল সৈরিন্ধ্রী। হন হন করে চলছিলাম ঘরমুখো। বাজার হল না। রাগে হাঁড়ি হয়ে আছে সৈরিন্ধ্রীর মুখ। পাল্লা দিয়ে বড় বড় পা ফেলছে আমার মতন আর গজরাচ্ছে থেকে থেকে। পথে দেখা নারান ভটচাযের সঙ্গে। পুজো সেরে কোথায় চলেছে। কারো পানে তাকাবার ফুরসৎ নেই যেন। আঙুলের ওপর আঙুল রেখে কী যেন গুণছে মনে মনে। সন্দেহ হল মন্ত্র আওড়াচ্ছে হয়ত। চণ্ডীর মা দেখি ঠিক সেই গাছটার নীচে বসে আছে এক রাশ হাঁড়ি কুঁড়ি নিয়ে। বিড় বিড় করছে রাস্তার

দিকে চেয়ে। বলছে…আসুক না, গুণে গুণে তিন লাথি মারবো মুখের ওপর। আস্পর্ধা বেড়েছে হারামজাদা মিন্‌সের। বলি মাগকে পথে ফেলে যাবার সময়ে মনে পড়ে নি পীরিতের কথা? এখন লালা ঝরছে জিব দিয়ে! চণ্ডীর মাকে দেখে দুঃখ হল নতুন করে। গলায় একটা ছেঁড়া জুতো ঝুলিয়েছে; পুরোনো ময়লা কাপড়ের একটা টুকরো বেঁধেছে মাথার ওপর। ভাঙা, আধভাঙা মালসার একটা পাহাড় তুলেছে গাছের গুঁড়ির ধারে।

সৈরিন্ধ্রী বলল—চলে এস চট্ করে। ওদিকে তাকিও না, বেম্মোদত্যি আছে ও গাছে।

দু কোশ পথ ভেঙে রেল স্টেশন। খবর এল দু দিন থেকে গাড়ী বন্ধ। মাঝ পথে পর পর দুটো গাড়ী কাত হয়ে পড়ে আছে। মনে মনে ভাবলাম—জোর কাজ হচ্ছে তাহলে। কোনো দিক থেকে খবরাখবর আসবার জো নেই। গাড়ী বন্ধ। খবরের কাগজও বন্ধ সঙ্গে সঙ্গে। দেশময় কী হচ্ছে জানি না। পূব সীমান্তের কত কাছে এল ওরা তারও খবর নেই কোনো। কখনও কখনও গুজব শুনি আসাম ভেঙে জলস্রোত এগিয়ে আসছে নাকি!

সন্ধের দিকে জুড়ন এল ধুঁকতে ধুঁকতে। বলল—রাতের বেলা সুবোধবাবু আসছেন আজ। খবর নিয়ে যাবেন, নির্দেশ দিয়ে যাবেন কি করতে হবে না হবে। সবাই হাজির থাকবে ঠিকমত। সুবোধবাবুকে চিনতে কষ্ট হবে একটু। বড় বড় দাড়ি, পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আলখাল্লা, চোখে কালো চশমা।

গম্ভীর হয়ে বললাম—বেশ, এ দিকটায় আমি খবর দিয়ে দিচ্ছি এক্ষুণি। তোমায় ভাবতে হবে না কিছু।

ফৌজ? কোথায় ফৌজ? কয়েকটা দিন কেটে গেল এমনি করে।

সুবোধবাবু বললেন—অত নিশ্চিন্ত হোয়ো না। প্রস্তুত হচ্ছে, যে কোনো মুহূর্তে এসে পড়বে হৈ হৈ করে।

নতুন করে প্রাণে ভয় এল আবার। তবু সুবোধবাবুর কথাগুলি মনে গাঁথা থাকল। ঘোড়ার খুর ইউনিয়ন বোর্ডের সাঁকোটা পেরিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে গেল ধীরে ধীরে। তবু শব্দগুলো যেন হাতুড়ী পেটার ঘা। মনের মধ্যে নাড়া দিয়ে গেছে চাবুক মেরে।

সুবোধবাবুর কথা মত ধান ক্ষেতের মাঝখানে পাহারা বসল দিকে দিকে। গ্রামের যত ছোট ছেলেমেয়ে হাঁটু-ডুব জলে গিয়ে বসল। থৈ থৈ করছে ধান ক্ষেত। সবুজ—ঘন সবুজ ডগাগুলো সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাওয়ায় মাথা ঝাঁকানি দিচ্ছে থেকে থেকে। ছেলেমেয়েরা গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছে। ফৌজ এলে আগে থেকে খবর দেবে সবাইকে।

এক দিন গেল। দু দিন গেল। তৃতীয় দিন সকালে শুনলাম বিউগল্। যেন দূর থেকে, বহু দূর থেকে পাক খেয়ে খেয়ে আসছে শব্দটা। একটা দুরন্ত উত্তেজনায় সারা শরীর ঘেমে উঠল। সৈরিন্ধ্রী দেখলাম ভয়ে লুটোপুটি খাচ্ছে জমির ওপর। ময়না নেই। তার ছেলেকে নিয়ে সে শ্বশুরবাড়ী গেছে দিন কয়েক হল।

হাজার পায়ের শব্দ! জনমানবহীন রাস্তাঘাট জেগে উঠল বুটের আওয়াজে। সাঁকোটা পেরিয়ে জলস্রোত বরাবর চলে আসছে যেন গ্রামের মধ্যে। কাদা-গায়ে ছেলেগুলো ছুটে গেল দিগ্বিদিক। আওয়াজ শুনলাম পর পর দুটো। ধোঁয়া দেখা গেল আকাশের এক কোণে। তার পর চুপ চাপ। সৈরিন্ধ্রীকে জোর করে টেনে আনলাম বাইরে। সামনে স্যাঁত স্যাঁতে ফাঁকা জমি। দৌড়তে দৌড়তে এসে আশ্রয় নিলাম ধান ক্ষেতে। ঘন সবুজ ধান গাছের ঝোপ। রবারের পুতুলের মতন

সৈরিন্ধ্রী মাথা হেঁট করে জলের মধ্যে ডুবে রইল। কিছু দূরে দেখলাম সবুজ ডগাগুলো নড়ছে নাড়া খেয়ে। ঝোপের মধ্যে মাথা নীচু করে বসে আছে দু জন মেয়ে। ফিস ফিস করে কী যেন বলছে পরস্পরের মধ্যে ! জলে ভিজে পায়ের পাতাগুলো হিম হয়ে গেছে ঠাণ্ডায়।

দুপুর নামল। কিছু দূরে তখনও গর্জন শোনা যাচ্ছে মেসিনের। কারা যেন চিৎকার করছে গলা ফাটিয়ে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। সৈরিন্ধ্রীর হুঁস নেই কোনো। বেহুঁস হয়ে শুয়ে পড়েছে পাকিয়ে। সুবোধবাবুর কথা মনে পড়ল। ঘোড়ায় চড়া সেই আলখাল্লা পরা মূর্তি। খুরের শব্দগুলো যেন এখনও কানের মধ্যে ঘা মারছে। মনে হল সূর্য ওঠবে না আজ আর। মেঘ করেছে সারা আকাশ জুড়ে।

একলা শুয়ে থাকল সৈরিন্ধ্রী। আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়লাম। ধান ক্ষেত ডিঙিয়ে আম কাঁঠালের জঙ্গল। ঘাস-ওঠা পথ ধরে চললাম থানার দিকে।

জুড়ন, কেষ্ট—কোথায় ওরা ? বুকের মধ্যে ঘা মারছে হাজারটা হাতুড়ী। দূর থেকে দেখলাম ওরা অধিকার করে নিয়েছে থানা। আমাদের কেউ নেই তার চার পাশে। বুকটা কেঁপে উঠল। অসহায় মনে হল নিজেকে। কোথায় আমরা ? আর কোথায় সেই আরাকানের বন্ধুরা ?

সন্ধের অন্ধকারে ফিরে এলাম পা চালিয়ে। টিপ্ টিপে বৃষ্টি শুরু হয়েছে একটানা। সাবধানে সৈরিন্ধ্রীর ভারী দেহটা তুলে আনলাম। তখনও ঘুমোচ্ছে সে। সমস্ত হাত পা হিম হয়ে গেছে ঠাণ্ডায়। আগুন জ্বালিয়ে সেঁক দিলাম সারা রাত। মাঝরাতে চোখ মেলে চাইল একবার। বুঝলাম ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে গেছে সারা শরীর। সত্যেন ডাক্তারের বাড়ী যেতে হবে কাল সকালে।

দু কোশ পথ ভেঙে স্টেশনের ধারে সত্যেনবাবুর ডাক্তারখানা। সকাল সকাল হাজির হলাম সেখানে।

সত্যেনবাবু খুসী হলেন আমাকে দেখে। বললেন—কী খবর! এত সকাল সকাল যে। কার অসুখ বিসুখ করল আবার?

সৈরিন্ধ্রীর। সংক্ষেপে উত্তর দিলাম। তার পর খুলে বললাম সমস্ত ঘটনা।

মুখের রেখাগুলো শক্ত হয়ে গেল সত্যেনবাবুর, গম্ভীর হয়ে বললেন দাঁড়াও ঔষধ দিচ্ছি। কিন্তু তুমিও এ সবের মধ্যে আছো তাহলে গোরাচাঁদ?

কিসের মধ্যে? জিজ্ঞেস করলাম।

এই কোলাহলের মধ্যে।

হাঁ। আমি থাকবো না কী রকম? আমিও তো দশের একজন। অবাক হয়ে জবাব দিলাম। ভাবলাম, এ কী কথা বলছেন জেল-ফেরৎ সত্যেনবাবু!

আমাকে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে গেলেন ডাক্তারবাবু। চৌকীতে বসালেন জোর করে। তার পর কথা বলে চললেন আমার দিকে চেয়ে। নক্‌সা খুলে দেখালেন মাঝে মাঝে। কখনও বুঝে, কখনও না বুঝে মাথা নাড়লাম। নতুন কথা শুনতে কেমন যেন লাগল বার বার। কই, এমন কথা তো কোনো দিন শুনি নি কারো মুখে!

ডাক্তারবাবু বললেন—একবার ভালো করে ভেবে দেখো। এখনও ফেরবার পথ আছে গোরাচাঁদ।

ওষুধ নিয়ে ফিরে আসছি। কেবল মনে হতে লাগল কোথায় ক্ষেতুবাবু, কোথায় সুবোধবাবু? তাদের একবার বলে দেখি ডাক্তার বাবুর কথা। নতুন দুর্যোগ নাই বা ডেকে আনলাম দেশের মধ্যে।

সৈরিন্ধ্রী ডাক্তারবাবুর ওষুধ খেয়ে সুস্থ হল। কিন্তু কেমন যেন হয়ে গেল। থেকে থেকে ভয় পায়, ফিট হয়ে পড়ে, ভালো করে কথা বলতে পারে না মুখ ফুটে।

গোরাচাঁদ হঠাৎ কাশতে কাশতে থেমে গেল। গলায় কি একটা আটকেছে যেন!

তারানাথ বলল—আবার আরেক দিন শুনব তোমার গল্প। আজকের মত এখানেই থাক। ও দিকে আলো উঠে পড়েছে দেখছো।

গোরাচাঁদ উদাস হয়ে তাকিয়ে দেখল আকাশের দিকে। সত্যি কালোর ওপর সাদা দাগ পড়েছে এলোমেলো। ভোরের আলো ফুটছে ধীরে ধীরে। সরু সরু শিমুল গাছগুলো খাড়া হয়ে আছে অশরীরি ভূতের মতন।

হঠাৎ শিমুলের জঙ্গল থেকে সির সিরে ঠাণ্ডা হাওয়া এল এক আঁজলা।

তারানাথ বলল—ডালপালা পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। এবার শুতে যাও তোমরা সব।

প্রাচীরপত্র

দুপুর দেড়টার মালগাড়ী চলে গেছে অনেকক্ষণ। দোতলা টিনের ছাউনীর নীচে বসে বসে মনের আনন্দে বিড়ি টানে গঙ্গাধর। সিগনেল দেয়ার কাজ তার শেষ হয়েছে। এবার আবার তিনটেয়ে— প্যাসেঞ্জার ট্রেন আসবে টিকোতে টিকোতে। লোকজনে সরগরম হয়ে উঠবে স্টেশন। মাস্টারমশাই পাঁয়তারা কসবেন। ডাক নামাবে, মাল নামাবে কুলীরা। তার পর বাঁশী বাজার পর এক ফালি টিনের স্টেশনকে পেছনে রেখে ট্রেনের চাকাগুলো উড়াল দেবে ঘনায়মান বনের ভেতর দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু চুপ চাপ, নিষ্প্রাণ, নিস্তব্ধ। গঙ্গাধর রোজকার মতন তুলসীর চায়ের দোকানে গিয়ে দু পয়সার চা খাবে ঢক্ ঢক্ করে। চা খেয়ে কেবিনের গায়ে লাগানো কাঠের বেঞ্চীতে বসে বিড়ি ধরাবে আয়েস করে। বুকিংবাবুর আদুরে ছেলেটা আসবে হাসতে হাসতে। গল্প করবে। ট্রেন আসবে আবার সন্ধে সাতটায়

আর রাত দুটোয়। অবিশ্যি তার আগে মার্লগাড়ী যাবে একটা। থামবে না। বাঁশী বাজিয়ে বেরিয়ে যাবে ঊর্ধ্বশ্বাসে। ঈস্ কী দেমাক্। মাটিতে চাকা পড়তে চায় না যেন।

বিড়ি টানে গঙ্গাধর। পাশের মাস্টারবাবুর ঘর থেকে শব্দ আসে টক্ টক্ ট-রে টক্। কিছুক্ষণ পরে থেমে থেমে শব্দ আসে। মাস্টার-বাবুর গলা শোনা যায়। কুলীকে গাল দিচ্ছেন, শাসাচ্ছেন। মাল নামাতে গিয়ে কাঠের বাক্সটা মাটীতে পড়ে দু ফাঁক হয় গেছে। খড়ের ভেতর থেকে নাকি দেখা যাচ্ছে কাঁচের গ্লাস, লণ্ঠনের চিমনি, চায়ের কাপ। সমস্ত কিছু আট দশটা টুকরো হয়ে চৌচির হয়ে গেছে।

বেল্লিক, হারামজাদা কোথাকার। কাজ করবার সময়ে কাজে মন থাকে না, না। ফাঁকি দিতে পারলেই বেঁচে গেলি! হিন্দুস্থানী কুলীটার ওপর মুখিয়ে ওঠেন মাস্টারবাবু।

নিস্প্রাণ, জনবিরল স্টেশনের ওপর নেমে আসে পাথুরে নিস্তব্দতা। টিনের চালের ওপর শুধু মাঝে মাঝে শব্দ হয় পাতা পড়ার—টুপ্ টাপ্। কিংবা সরু পা ফেলে নেচে যায় দু একটা শালিক।

গঙ্গাধর ভাবে অন্য কথা। দু দিন বাদে তার পোয়াতি মেয়েটা আসবে বাপের বাড়ী। আঁতুড়টা সেরে আবার সোয়ামীর ঘরে চলে যাবে। আসা আর যাওয়ার মাঝখানে যে সময়টুকু শুধু সেই সময়টুকুর জন্যেই যত ভাবনা গঙ্গাধরের। এই কটা দিনই বা কী কম। মেয়েটার ম্যাও সামলাতে সামলাতে ফতুর হয়ে যাবে সে। জামাইকে খুব ভালো করেই চেনে। সময় হলেই পোয়াতি বউকে সে পাঠিয়ে দেয় শ্বশুরবাড়ী। দাই, ওষুধপত্তর, কাঁথা, জামাকাপড় যাবতীয় সব কিছুর খরচ গঙ্গাধরই দেয়। নবজাতকের মুখ দেখে একটা রূপোর টাকাও দিতে হয় তাকে। গঙ্গাধরের বউকে দিতে হয় ঝুমঝুমি, খেলনা, কাটুপিসের

রঙচঙে ফ্রক আরও কত কি। এমন কী গঙ্গাধরের ছোট মেয়েটা পর্যন্ত বায়না ধরে পুতুল উপহার দেবে বলে। গঙ্গাধর রাগে ভুরু কোঁচকায় কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তার পর বলে—দেব, দেব, সব কিনে দেব। মাইনে পাই আগে। পাড়াপড়শীরা বেড়াতে আসে। যাবার সময়ে রূপোর টাকা গুঁজে দিয়ে যায় যার হাতে। বলতে গেলে মেয়েটা ছেলে বিয়োতে এসে রোজগার করে নিয়ে যায় রীতিমত। এখানেই শুধু থামে না। যাবার সময়ে মেয়েটা আব্দার করে বাপের কাছে—এটা চাই, ওটা চাই। গঙ্গাধর না কর্তে পারে না।

রোগা মেয়েটাকে খাইয়ে দাইয়ে মোটা করে গঙ্গাধর। তার পর জামাই আসে একদিন সকালে, নির্ব্বিকার, নিশ্চিন্ত স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে। তর সয় না। দুপুরের গাড়ীতেই বউকে নিয়ে উধাও হয়। কাজের চাপ নাকি ভয়ানক বেশী। গঙ্গাধরের সঙ্গে বড় জোর কয়েক মুহূর্তের জন্যে কথা হয় তার। গাড়ী ছেড়ে দেয় তার পর। গঙ্গাধর তার কেবিনে ফিরে আসে। মনে হয় সমস্ত জগৎটা ধোঁয়া দিয়ে তৈরী। মাস্টারবাবুর পাশের ঘরে তখন বুকিংবাবুর পাঞ্চিং মেসিনের খট্ খট্ শব্দ থেমে গেছে।

গঙ্গাধর তার মেয়ের কথা ভাবে। আজ বাদে কাল এসে পৌছবে সে। তার পর কী দিয়ে কী হবে? যুদ্ধের বাজারে গঙ্গাধর নিজের সংসারই সামলাতে পারে না। দেনা হয়ে পড়েছে এখানে সেখানে। মাগ্‌গী ভাতা দাম বাড়ার অনুপাতে আর কতটুকু? গঙ্গাধরের বউ বলছে, না লিখে দাও আসতে। সে ভাবে—তাই কি দেয়া যায় লিখে? কী না কী ভাববে জামাই।

জামাইয়ের ভাবনা ভাবিয়ে তোলে গঙ্গাধরকে।

ট্রেন আসার সময় হয়ে এল বলে। দলে দলে যাত্রীরা আসে। হাওয়া

খেতে আসে বহু লোক। এক্ষুণি গাড়ী থেকে নামবে টাটকা কাগজ। খবরের জন্যে হুমড়ি খেয়ে পড়বে একশো জোড়া চোখ। রুশ-জার্মান যুদ্ধের খবর, জাপানী হামলার খবর, কংগ্রেসের খবর।

গঙ্গাধর হাতল ধরে টানে। অতি পরিচিত শব্দ হয় কয়েকবার। তার পর ওদিকে ঘণ্টা পড়ে। ট্রেন আসতে আরও মিনিট কুড়ি বাকী।

প্ল্যাটফর্মে কয়েকজনকে একসঙ্গে টহল দিতে দেখা যায়। পায়জামা কিংবা হাফ-প্যাণ্ট পরা। মুখে ঘামের চিহ্ন। চুলগুলো শুকনো। সীঁথে না কেটে পেছন দিকে টেনে দেয়া। দু একজনের হাতে লাল নিশান, দরমায় আঁটা বড় বড় পোস্টার। গঙ্গাধর নিজের ছেলেকে দলের মধ্যে দেখতে পেয়ে রাগে পাথর বনে যায় কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তার পর পুরোনো অবস্থায় ফিরে আসে। একটা ঠাণ্ডা স্রোত নীচে নেমে যায় শিরদাঁড়া বেয়ে। এ একটা নতুন কিছু নয়। নিজের ছেলেকে ভালো করেই বোঝে গঙ্গাধর। হয়ত মজুর এলাকায় যাচ্ছে ট্রেনে করে। কিংবা কোনো কিসান ঘাঁটিতে। ফিরবে হয়ত রাত দুটোর গাড়ীতে। বাড়ীতে গিয়ে কড়া নাড়বে অত রাতে বা স্টেশনে পড়ে থাকবে বাকী রাতটুকু।

তৃতীয় ঘণ্টা পড়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে ট্রেন এসে থেমে যায় প্ল্যাটফর্মের গা ঘেঁষে। গঙ্গাধর ছুটোছুটি করতে করতে সবদিকে নজর রাখে। কারা নামল, কারা উঠল। দেখে দেখে অরুচি ধরে গেছে এক রকম। তবু প্রায়ই চেনা মুখ চোখে পড়ে। তারা হাত নেড়ে আন্তরিকতা জানায়। মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে বাড়ীর কে কেমন আছে।

গঙ্গাধর দেখে একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় সেই পায়জামা পরা দলটি উঠল। তার ছেলে, জগৎও উঠল তাদের সঙ্গে। গঙ্গাধর দলের

প্রায় প্রত্যেককেই চেনে। সবাই সাম্যবাদী সংঘের কর্মী। এ অঞ্চলে তাদের পরিচয় পেতে কারো বাকি নেই। কেউ সুখ্যাতি করে, কেউ গাল দেয়।

বাঁশী বাজে। চকিতের মধ্যে ট্রেন উধাও হয়ে যায় বনের আড়ালে। গঙ্গাধর নিশ্চল হয়ে বসে থাকে কাঠের বেঞ্চীর ওপর। ক্রমবিলীয়মান চাকার শব্দ মনে হয়, নিস্প্রাণ রেল লাইনে সাড়া জাগাচ্ছে। আজ আর গঙ্গাধর তুলসীর দোকানে চা খেতে যায় না। চা পাঠিয়ে দিতে দোকানে খবর পাঠায়। প্ল্যাটফর্মের সংবাদভুক ছেলেরা একে একে হৈ চৈ কর্তে কর্তে চলে যায়। লালফৌজ নাকি ভেড়ার পালের মতন পিছু হটছে। যে কোনো মুহূর্তে মস্কো আত্মসমর্পণ করবে! রাজধানী নাকি সরে গেছে সাড়ে পাঁচশো মাইল দূরে! পাণ্ডা মতন এক মাতব্বর ছেলে সবাইকে সনাতনের দোকানে নিয়ে যায়। আজকে সকলের জলখাবারের খরচ ছেলেটি নিজেই দেবে।

গঙ্গাধর ঢক্ ঢক্ করে চা খায়। আর ভাবে। যত সমস্যা তার জগৎকে নিয়ে। ছেলেটাকে গঙ্গাধর এ পর্যন্ত শাসনে আনতে পারল না। দড়াদড়ি দিয়ে যত বাঁধতে যায় ততই ঢিলে হয়ে যায় বাঁধন। গঙ্গাধরের এই অভাব অনটনের সংসারে জগৎ আর কতটুকু সাহায্য করে? জুট অফিসারের আপিসে কাজ করে সে যা রোজগার করে তার চেয়ে ডবল অর্থোপায় করে গঙ্গাধর নিজে। আসলে তার প্রধান আপত্তি হল ছেলের রাজনীতিতে। বেশীর ভাগ সময় সে থাকে সাম্যবাদী সংঘের আপিসে। মাটির তৈরী কাঁচা দোতলা বাড়ীর অন্ধকার ঘরে বসে বসে সে পোস্টার লেখে, মিটিং করে, চালের জন্যে মিছিল বের করে, টাকা তোলে দুর্ভিক্ষের জন্যে। বাড়ী গিয়ে গিয়ে সংঘের কাগজ বিক্রী করে। সময়ে সময়ে মজুর এলাকায় গিয়ে বলে—পয়সা বাড়াও। ইংরাজের

ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে দাও এই করে। কিসানদের কাছে গিয়ে বলে—ফসল বাড়াও, বাংলার দুস্থ ভাইবোনরা বসে আছে তোমাদের পথ চেয়ে। গঙ্গাধরের মাথায় রাজনীতি ঢোকে না। তার কাছে সব কিছু মনে হয় হাস্যকর, বাড়াবাড়ি।

তবু জগৎ নিজের কাজ সমানে চালিয়ে যায়। আজ মিটিং, কাল মিছিল, পরশুদিন পাঠ-চক্র, তার পরের দিন হয়ত ডাক পড়ল জেলা কমিটিতে—খবরাখবর দিতে যেতে হবে স্থানীয় অবস্থার। শত অভাব অনটনের মাঝখানে সে বেঁচে আছে। এবং ভালো করেই বেঁচে আছে বলতে হবে। এক একদিন বাড়ীতে গিয়ে শোনে রান্না হয় নি। চাল সংগ্রহ করলে তবে রান্না হবে। সম্ভব হলে জগৎ সংগ্রহ করে আনে চাল। তখন রান্না চড়ে। ততক্ষণ ভাই বোনেদের সঙ্গে গল্প করে জগৎ। তিনটে বাজে। দুপুরের গাড়ীটা এসে চলে যায়। ঘুম পায় জগতের।

চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে মগটা দূরে সরিয়ে রাখে গঙ্গাধর। আজ আর এল না বুকিংবাবুর ছেলেটা। হয়ত খেলতে গেছে মাঠে। মাস্টার-বাবুর ঘর খালি পড়ে। বুকিংবাবু এসে আলাপ জমায় গঙ্গাধরের সঙ্গে। বলে—কবে আসছে তোমার মেয়ে গঙ্গাধর?

কি জানি? হয়ত আসবে দু চার দিনে। গঙ্গাধর অন্যমনস্ক হয়ে উত্তর দেয়।

ক মাস হল? বুকিংবাবুর কৌতুহল প্রকাশ পায়।

তাও জানি না। তবে মেয়ের মা বলল নাকি দশ মাসে পড়েছে।

ভালো, ভালো। তবে আর বেশী দেরী কী? এসে পড়লেই হল।

জবাব দেয় না গঙ্গাধর।

বুকিংবাবু নিজেই বলে—তার পর এ নিয়ে কটা হল?

মোট পাঁচটি হয়েছিল। দুটি মারা গেছে জন্মাবার পর। গত বছর
হয়ে গেছে একটি।

আহা। বুকিংবাবু প্রচলিত সহানুভূতি জানায়।

গঙ্গাধর এ কথাটা এড়িয়ে যায়। বলে—জামাই আমার লোক ভালো। বড় সাধাসিদে মানুষ। মেয়েটাকেও ভালোবাসে প্রাণ দিয়ে। কিন্তু এবার বাজার যেমন আটক্যরা, কিছু যত্ন আত্তি কর্তে পারবো বলে মনে হয় না।

না নিলেই পারতে এবার আঁতুড়ের ঝক্কি। উপদেশ দেবার ভঙ্গীতে বলে বুকিংবাবু। তাছাড়া এই বা কেমন ধারা কথা যে প্রত্যেকবার তোমাকেই সমস্ত খরচ দিতে হবে। দিলেই পারে সে কিছু টাকা। এমন নয় যে সে রোজগার করছে না।

তাই কি হয়? কী যেন বলতে গিয়ে থেমে যায় গঙ্গাধর। তৃতীয় ব্যক্তির কাছে জামাইয়ের সমালোচনা শুনতে তার ভালো লাগে না।

বুকিংবাবুও ইচ্ছে করে চেপে যায়।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে। তার পর এক সময়ে জমিতে পা ঘসতে ঘসতে বুকিংবাবু বলে—তোমার কিছু ঘি লাগবে নাকি গঙ্গাধর? দরকার হয় তো সন্ধের দিকে পাঠিয়ে দিও ছেলেটাকে। দিয়ে দেব কিছু।

ঘি? ঘি কোত্থেকে পেলেন? গঙ্গাধর উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করে।

রাউতদের কয়েক টিন ঘি এসেছিল বিহার থেকে। কাল রাতে কিছু বের করে নিলাম ফুটো করে।

বেশী না, খুব সামান্য। আধেকটা পাঠিয়ে দিলাম মাস্টারবাবুর ঘরে। মেয়ে আসছে, তোমারও তো কিছুটা দরকার লাগবে। বুকিংবাবু মাথা নাড়ে সহানুভূতিসূচক।

গঙ্গাধর কথা বলে না। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। মাস্টারবাবু ব্যস্ত

বছর এক নাগাড়ে কাজ করছে সে। আজ হঠাৎ তার ছেলে কী না কী করল বলে চাকরী যাবে তার?

আবার এক স্তূপ কাগজের মধ্যে ডুবে যান মাস্টারবাবু। বাদামী কাগজের ওপর দাগ কাটেন মাঝে মাঝে—লাল, নীল। কোনোটায় আবার কালো কালির আঁচড় দেন। গঙ্গাধর কিছুক্ষণ বসে বসে দেখে। তার পর এক সময়ে উঠে দাঁড়ায়। মাস্টারবাবু কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বলেন—যাও, এবার কাজে যাও। বাড়ী গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখো—কি করা যায় এ নিয়ে। হাঁ, ভালো কথা ছেলেটাকে বলে দিও স্টেশনে যেন কোনো পোস্টার না দেয়। এবার দেখতে পেলে কিন্তু আমি থানায় খবর দেব।

গঙ্গাধর ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। সীতারামের ডিউটি শেষ হয়েছে। এবার তার পালা।

মাস্টারবাবুর কথা নিয়ে গঙ্গাধর ছেলের সঙ্গে বিশেষ কোনো আলোচনা করে না। জুট আপিসের চাকরীটা যাওয়ায় জগৎ নিজেই একটু কাতর হয়ে পড়েছে। গঙ্গাধরের ভয় করে তার সঙ্গে কথা বলতে।

নিজের কাজ গঙ্গাধর ঠিকমত করে যায়। বাকী সময়টুকু সংসারের পেছনে খরচ করে। বাড়ীতে নাতনীরা এসেছে। সময়ে অসময়ে তাদের কান্নায় ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে দিনগুলো। জামাইকে একটা চিঠি দেয় গঙ্গাধর—মিণ্টু ভালো আছে। পড়াশোনা করছে মন দিয়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার দুষ্টুমিও বেড়েছে কম নয়। সময়ে সময়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায় একলা। লোক পাঠিয়ে খুঁজে আনতে হয় তাকে। বিন্দির সর্দিকাশি হয়েছিল। এখন সেরে উঠেছে এক রকম। ভালো দুধের ব্যবস্থা করেছে গঙ্গাধর। খেয়ে দেয়ে দু দিনে মোটা উঠবে বিন্দি। তার পর নিজের মেয়ের কথা লেখে গঙ্গাধর। ভালোই আছে

সে। একটু যা কাহিল হয়ে পড়েছে যন্ত্রণায়। তা এখন ওষুধ চলছে ডাক্তারের। চিঠি লিখে তার মনের কোথায় যেন খচ্ খচ্ করে। এ পর্যন্ত একটা নাতির মুখ দেখল না গঙ্গাধর। সবগুলোই মেয়ে। এবার দিলেই পারে একটা ছেলের জন্য। গঙ্গাধর যেন মনে মনে ভগবানের কাছে নাতির জন্যে প্রার্থনা জানায়।

সংসারের অবস্থা খারাপ হয় দিন দিন। একটার পর একটা তালি পড়ে ছিদ্রের ওপর। রাউতদের দোকানে চাল গম উধাও হয়ে যায় রাতারাতি। কেরাসিন নেই, তেল নেই, নুন নেই। চণ্ডীচরণের দোকানে কাপড়ের দাম ওঠে তিন গুণ। এস, ডি, ওর হুকুমে নিরন্ন নিবস্ত্র মিছিল লাঠি খেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে ফিরে যায়। রাশিকৃত রিপোর্ট জমা হয় থানার ফাইলে। জগতের কপালেও কয়েকটা রুলের দাগ পড়ে। জগৎ পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায় পাছে দাগগুলো বাপের চোখে পড়ে।
গঙ্গাধর মাঝে মাঝে বুঝতে চেষ্টা করে তার ছেলেকে। মনে করে সে ভালো কাজই করছে, কল্যাণ করছে বৃহত্তর মানবতার। অন্তত তাই বলেই সময়ে সময়ে সান্ত্বনা দেয় তার মনকে। আবার কখনও কখনও ভাবে জগৎ কী জানে বৃহত্তর কল্যাণের? কত বড় বড় লোক রয়েছে দেশে—রাজনীতি করবে তারা।
ছেলের কপালে রুলের দাগ পড়েছে জেনে চিন্তা হয় গঙ্গাধরের। এবার হয়ত সত্যিই তার চাকরী গেল। একবার ওপরআলার কানে গেলেই হল। তার পর আর তাকে বাঁচায় কে। জগতের মিছিলে গিয়ে তাকেও যোগ দিতে হবে ঝাণ্ডা কাঁধে করে। হাজার গলায় ঐক্যতান তুলতে হবে—'চাল চাই, কাপড় চাই।' তার পর—রুলের গুঁতো, অগ্নিবর্ষী

বন্দুকের ঝলক, হাজত বাস। কেবিনে বসে বসে ঘুম আসে। নিষ্প্রাণ, কলকোলাহলহীন স্টেশনটা যেন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মাটির ওপর আর টিনের ছাউনীর নীচে বসে বসে দুঃস্বপ্ন দেখছে গঙ্গাধর—তার জীবন, তার সংসার, তার মেয়ে জামাই, তার ছেলে, চারদিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে হাজার টুকরোয়।

কেবিন থেকে নেমে তুলসীর দোকানে গিয়ে চা খায় গঙ্গাধর। ভাঙা ভাঙা আলাপ জমায়। রায়েদের ছোট মেয়েটার বিয়ে হচ্ছে। খুব ঘটা করে, আট দশ হাজার টাকা খরচ করে বিয়ে দিচ্ছে এই বাজারে, বুকের পাটা আছে বলতে হবে, ছেলেটি নাকি বিলেত-ফেরৎ ইঞ্জিনিয়ার; প্রচুর সম্পত্তির মালিক, কার্তিকের মতন চেহারা। তুলসী এক সময়ে কাজ করেছে রায়েদের বাড়ীতে। তাই তাকেও নাকি নেমতন্ন করেছে যাবার জন্যে। কাজকর্ম ফেলে তাকে যেতেই হবে খুকিদিদির বিয়েতে। তুলসী মনের আনন্দে বলে—বুঝলে, গঙ্গাধর শুধু রায়বাবুরা না খুকিদিদি নিজে আমাকে যেতে বলেছে। ঘরের এক পাশে ডেকে বলল 'তোমায় কিন্তু আসতেই হবে তুলসী। কাজকর্ম না হয় বন্ধ রাখবে একদিনের জন্যে। নইলে আমি ভয়ানক রাগ করব কিন্তু।' আত্মপ্রসাদে ফেঁপে ওঠে তুলসী।

গঙ্গাধর কিছু বোঝে না। মাথা নেড়ে সায় দেয়। তার পর এক সময়ে বিড়ি ধরিয়ে উঠে পড়ে বেঞ্চী ছেড়ে। সন্ধের সাট্‌ল ট্রেন আসার সময় হল।

স্টেশন কুলীটা এসে পথ আটকায় গঙ্গাধরের। ফিস্ ফিস্ করে বলে, বাবু ফের আবার সেই বদ ছেলেরা কাগজ মেরে গেছে স্টেশনের দেয়ালে। বড় বড় লাল রঙের ছবিআলা কাগজ। মাস্টারবাবু দেখলে কিন্তু কেলেংকারী করবে এক্ষুণি।